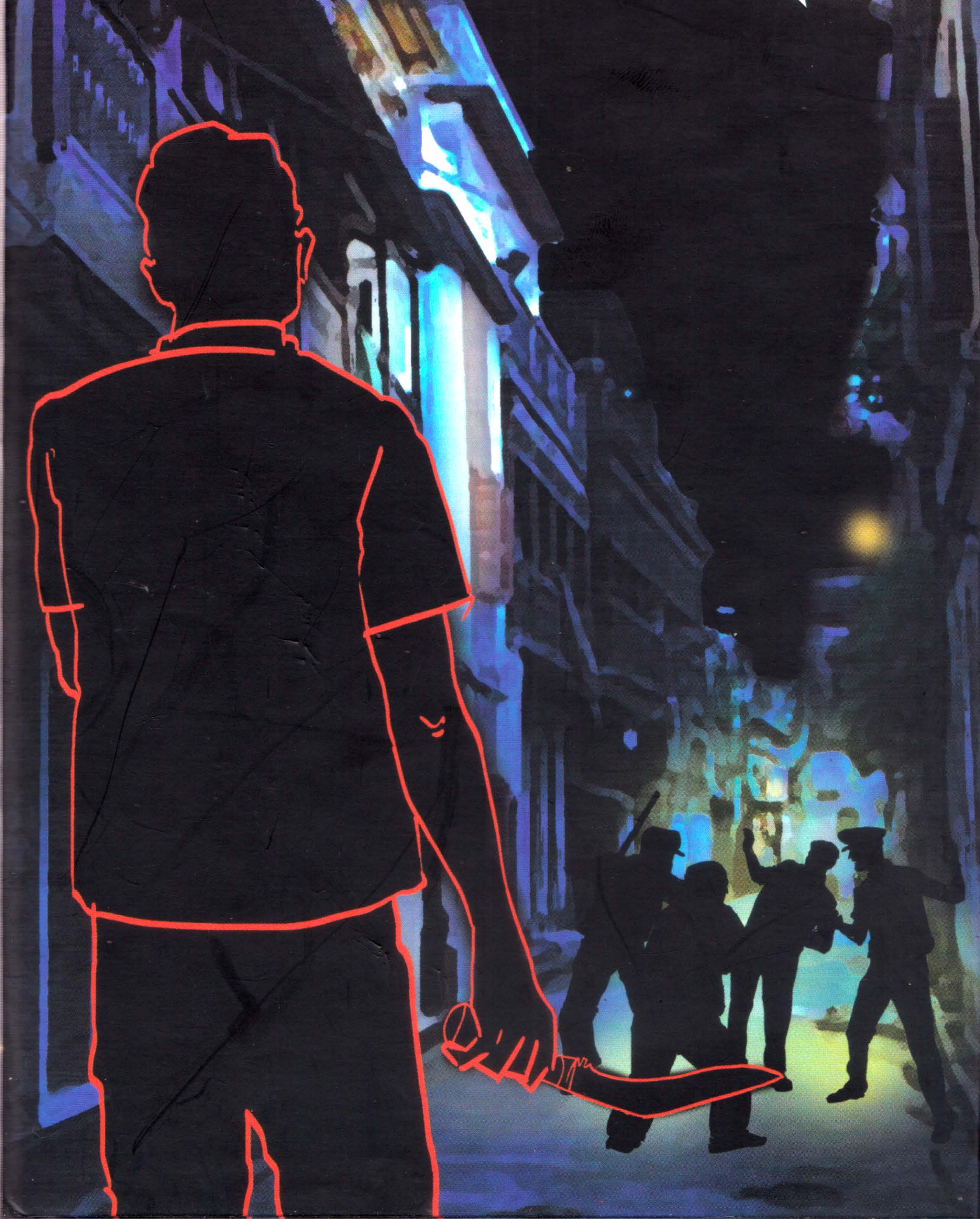
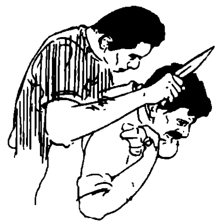
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

সব লজিকের বাইরে





সব লজিকের বাইরে

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

সব লজিকের বাইরে



পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ অগ্নিভ সেন

SOB LOGICER BAIRE
by Abhijnan Roychowdhury
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/ Patra Bharati

Price ₹ 200.00

ISBN 978-81-8374-446-1

অভ্যুদয় ও অর্কোদয়কে

অনেক আদর ও ভালোবাসায়

বাবা

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

ক রহস্য

ভৌতিক অলৌকিক

মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন

সংকেত রহস্য

গ্লোবাল ওয়ার্মিং

রহস্য যখন ডারউইন

অভিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান

শিরোনামের দুটি শব্দই আমাদের কাছে সুপরিচিত। এবং আমি এই দুটো শব্দকেই ভীষণ ভালোবাসি। কারণ, 'অভিজ্ঞান' মানে আমার প্রিয় লেখক অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর প্রথম নাম, আর 'কল্পবিজ্ঞান' শব্দটিকে আমি আমার ডাকনাম বলে ভাবতে ভালোবাসি।

এই দুটি প্রিয় শব্দের মেলবন্ধন ঘটেছে এই বইতে। কারণ, এই বইয়ের আঠেরোটি গল্পের মধ্যে দশটি গল্পই কল্পবিজ্ঞানের। তা ছাড়া বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের আধুনিক লেখকদের নামের সারিতে, আমার মতে, প্রথম নামটিই হল অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী। সুতরাং অভিজ্ঞানের কলম থেকে দশ-দশটি নতুন কল্পবিজ্ঞানের গল্প একসঙ্গে হাতে পাওয়া মানে হাতে চাঁদ পাওয়া। তার সঙ্গে বোনাস হিসেবে রয়েছে আরও আটটি অন্য স্বাদের গল্প। তার কোনওটির বিষয় রহস্য, কোনওটির বিষয় ভৌতিক, আবার কোনওটি একান্তভাবে মানবিক।

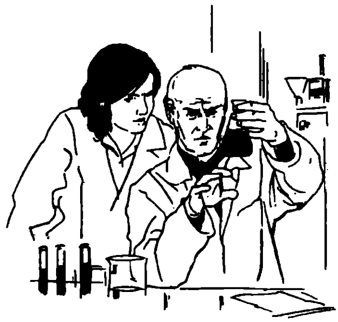
অভিজ্ঞান একজন বহুমাত্রিক লেখক। কুড়ি বছর প্লাস সময়ের লেখালিখিতে নানান গল্পে ও এটা বারবার প্রমাণ করেছে। ওর লেখায় একটা বিশেষ ধরনের আকর্ষণ থাকে—যেটা অভিজ্ঞানের অভিজ্ঞান, অথবা সিগনেচার। ওর লেখা পড়তে গিয়ে আমি বহুবার এর প্রমাণ পেয়েছি। এই কারণেই ও আমার অন্যতম প্রিয় লেখক।

পড়াশোনায় কৃতী সুলেখক এই মানুষটি আমার এতটাই কাছের এবং এতটাই স্নেহভাজন যে এই সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে সবসময় গর্ব অনুভব করি।

অভিজ্ঞানের গল্প পড়া আমার কাছে একটা অভিজ্ঞতা। আপনাদের সামনে সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেশ করতে পারছি বলে আমি ভীষণ খুশি। খুশি আশা করি আপনিও—সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়ে।

জানুয়ারি ৪, ২০১৭

অনীশ দেব





গ্যারি ক্যাসেলের চিঠি

মার্চের শেষ শনিবার। আমাদের সান্ধ্য-আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। এমনসময় হঠাৎ দরজা খুলে গেল। অনিলিখা। লালপাড়, হলুদ শাড়ি। হাতে একটা এয়ারমেল লাগানো খাম।

আমাদের কারো সঙ্গে কথা না বলে ঘরের কোণে রাখা সোফার ওপর বসে খাম খুলে চিঠিটা পড়তে লাগল।

কয়েক সেকেন্ড ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শাশ্বতী বলে ওঠে,—বিদেশ থেকে আসা বুঝি?

—হ্যাঁ, আমেরিকা থেকে। গ্যারি ক্যাসেলের কাছ থেকে।

—গ্যারি ক্যাসেল মানে সেই পদার্থবিজ্ঞান-পাগল ছেলেটা তো? দিনরাত বই নিয়ে বসে থাকত!—সাগ্নিক বলে ওঠে। সাগ্নিকের স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখর।

—হ্যাঁ, সেই গ্যারি ক্যাসেলই লিখেছে। এতদিন বাদে ওর চিঠি পেয়ে খুবই অবাক হয়েছিলাম, চিঠিটা পড়ে আরো অবাক হয়ে গেছি। কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছি না, মনে হচ্ছে যেন পাগলের প্রলাপ।

তা চিঠিতে কী লিখেছে পড়ে শোনাও না। অবশ্য যদি তোমার কোনও আপত্তি না থাকে।—বিশ্বজিৎদা ভুরু কুঁচকে বলে উঠল।

না আপত্তির কিছু নেই। তবে আমি পড়ে শোনাতে পারব না। অন্য কারুর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হোক। আমার গলাব্যথা।—অনিলিখা চিঠিটা এগিয়ে দেয়।

ঠিক আছে, আমিই সে ভার নিচ্ছি।—সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম।

অ্যাই, তুই পড়লে চলবে না। ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারিস না। দাও, আমাকে দাও।—বিশ্বজিৎদা অনিলিখার হাত থেকে চিঠিটা প্রায় ছিনিয়ে নিল।

বাঃ, হাতের লেখা তো বেশ। শুরু করছি।—বিশ্বজিৎদা চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

—তোমাদের জন্য চিঠিটা সহজ বাংলায় বলি—

অনিলিখা,

আশা করি ভালো আছ। কলেজের সেই দিনগুলো মনে পড়লেই আমার খুব খারাপ লাগে। সেই দিনগুলো বোধহয় আর ফিরে আসবে না। রাতে পাবলিক লাইব্রেরিতে পড়তে যাওয়া, ছুটির দিনে রাস্তায় রাস্তায় একসঙ্গে ঘোরা, বাস্কেটবল দেখতে যাওয়া—দেখতে দেখতে বেশ কয়েকবছর চলে গেল। তোমাদের কারোর সঙ্গেই আমার আর বিশেষ যোগাযোগ নেই।

তোমার ভারতের ঠিকানায় চিঠি লিখছি। জানি না, এ চিঠি তুমি পাবে কিনা। হয়তো এতদিনে তুমি বাড়ি পরিবর্তন করেছ। তবু আমার ধারণা, যদি এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছয়, তুমি হয়তো আমাকে বিশ্বাস করবে।

এম.এস. করার পর আমি ডক্টর র‍্যালফের সঙ্গে রিসার্চ করছিলাম। আমার গবেষণার বিষয় ছিল গাছেদের ভাব বিনিময়ের ক্ষমতা নিয়ে।

গাছেরা নিজেদের মধ্যে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে রেডিও সিগন্যালে ভাব বিনিময় করে। বিভিন্ন শ্রেণির গাছ বিভিন্ন কম্পাঙ্কবিস্তার ব্যবহার করে, যাতে তাদের

ভাষা আরেক প্রজাতির গাছ বুঝতে না পারে। গাছেদের মধ্যেও জাতিভেদ ছোটবড়—এসব আছে।

যাকগে, সেসব কথা। মোটমাট আমার কাজ ছিল গাছেদের ভাষা উদ্ধার করা। আমার তৈরি 'ট্রিল্যাঙ্গ' যন্ত্রটা আস্তে আস্তে কাজ করতে শুরু করল। যে-কোনও সঙ্কেত এলেই তাকে উদ্ধার করে ইংরেজি ও আরো চারটে ভাষার টেক্সটে পরিণত করত।

অবশ্য সেটা তো আর একদিনে হয়নি। বস্টনে আমার বাড়ির সামনে একটা গাছ ছিল। একধরনের পাইন গাছ। তা সেটাই ছিল আমার পরীক্ষার কেন্দ্র। এ ধরনের গবেষণায় বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান আর দর্শন সবকিছুই সমানভাবে কাজ করে। সকাল থেকে সন্ধে অবধি আমার কাজ ছিল ওই গাছটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকা। হাওয়ায় পাতা নড়ত, ডাল কাঁপত, পাতায় পাতায় সূর্যের আলো দোল খেত। ট্রিল্যাঙ্গের অনুভবী গ্রাহক অংশে সঙ্গে সঙ্গে কম্পাঙ্ক ওঠা-নামা করত।

আমি ওই গাছটার ওপর পড়া আলো বাতাস—এমনকী গাছটা যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে তাও পরিবর্তন করে করে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম। এভাবে মাসের পর মাস কেটে গেল।

মানুষ কখন ভাষার সাহায্য নেয়? যখন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়। আমার পরীক্ষার দ্বিতীয় ধাপে সেই নজর দিলাম। আশপাশে বেশ কয়েকটা গাছ লাগিয়ে শুরু হল আমার অনুসন্ধান পর্ব। গাছেদের ভাষা এত জটিল যে প্রথম প্রথম বুঝতে গিয়ে হিমশিম খেতে হত। দেখলাম খালি রেডিও সিগন্যালই নয়, নির্দিষ্ট কিছু পাতার কম্পন, ডালের সঙ্গে পাতার কৌণিক অবস্থান পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে এরা ভাব আদান-প্রদান করে। ট্রিল্যাঙ্গের সঙ্গে অত্যাধুনিক ক্যামেরা লাগিয়ে যন্ত্রটাকে আরো শক্তিশালী করে তুললাম।

যত দিন যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল আমি যেন আর পাঁচটা মানুষের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি। আর এক জীবজগৎ তার সবুজ পাতা আর ডালপাতা দিয়ে আমার জীবনকে আঁকড়ে ধরছে। এভাবে আরো দু-বছর গড়িয়ে গেল। সামনের পাইনগাছটা অন্য গাছগুলোর সঙ্গে গল্প করত, হাসাহাসি করত—আমি তাই শুনতাম।

গাছেদের সমাজ একটু অন্যধরনের। প্রত্যেকটা ডাল নিজেদেরকে আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ের অংশ বলে মনে করে। যে ডাল মাটির যত কাছাকাছি, সে ডালের স্থান সমাজে তত উঁচু। সে ডালের পাতারা তাই অন্যডালের পাতাদের সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। বরং তারা অন্য গাছের নীচের দিকের ডালের পাতাদের সঙ্গে কথা বলবে সেও ভালো। একটা গাছের সমাজে মূল বা শিকড়ই প্রধান। কারণ, সে মাটির সবথেকে কাছে। থাক সেসব কথা।

ট্রিল্যাঙ্গের সাহায্যে বুঝতে পারছিলাম সামনের গাছটার আয়ু শেষ হয়ে আসছে। বছর কয়েকের আলাপে ও-ই আমার সবথেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই গাছটা শুকিয়ে যেতে শুরু করল। একসময় যে পাতাগুলো সূর্যের আলোয় চকচক করে উঠত, সেই পাতাগুলোই সবার আগে কুঁকড়ে গেল, খসে পড়ল।

সেদিন সন্ধের সময় অ্যাপার্টমেন্টের পোর্টিকোতে বসে আছি, মন খারাপ। সঙ্গে ট্রিল্যাঙ্গ। সেদিনই বোধ হয় গাছটার শেষ দিন। পাইনগাছটার ব্যবহৃত কম্পাঙ্ক বিস্তারে টিউন করে বসে ছিলাম। হঠাৎ লেখা ফুটে উঠল—'তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ'।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। সঙ্কেতটা পাইনগাছ থেকেই এসেছে। কিন্তু কার উদ্দেশ্যে? সামনের ছোট ছোট ঘাসগুলোকে?

বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আবার লেখা ফুটে উঠল,—'তুমিই আমার অকালমৃত্যুর কারণ। দিনের পর দিন আমার উপর পরীক্ষা চালিয়ে তুমিই আমার মৃত্যু ডেকে এনেছ। কখনো মাটিতে বিষ দিয়ে, কখনও আমার অধিকারের এলাকাতে অন্য গাছ পুঁতে, কখনো বা ডাল ভেঙে। তুমি এসব কী জন্য করেছ জানি না, তবে আমার সঙ্গে শত্রুতা করে তুমি ভালো করোনি। এটুকু জেনে রেখো আমি ও আমার সম্প্রদায় তোমার উপর প্রতিশোধ নেব।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বুঝলাম এ আমার উদ্দেশ্যেই। আমি ওকে আমার পরম বন্ধু বলে ভাবলেও, ও আমাকে শত্রুর চোখে দেখে।

কিন্তু আমি তো ওকে আমার মনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার সম্বন্ধে ওর ভুল ধারণা শোধরানোর কোনও উপায়ও আমার জানা

ছিল না। শুধু এক বিদায়ী বন্ধুর উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু ও কী করে প্রতিশোধ নেবে বুঝতে পারলাম না।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে আমি বস্টন ছেড়ে ইন্ডিয়ানা স্টেটের এক ছোট শহরে চলে এলাম। আসলে ওই গাছটার মৃত্যুর পর আমার ওখানে খুবই খারাপ লাগছিল। নিজেকে কীরকম অপরাধী মনে হচ্ছিল।

এই শহরটা বস্টনের তুলনায় খুবই ছোট। নাম কলম্বাস। কামিন্স বলে এক বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানির সদর দপ্তর এখানে। তাকে ঘিরেই এই শহর। শহরের প্রায় সব অধিবাসীই কামিন্সের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে জড়িত। ওখানে একটা কমপ্লেক্সে বাড়ি পেলাম। কমপ্লেক্সের নাম স্টাইনহার্স্ট ম্যানর। কাঠের বাড়ি। সামনে বিশাল ঘাসের লন। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনেই পাইন বা চেরীগাছ লাগানো। কমপ্লেক্স থেকে বেরোলেই একটা বড় পার্ক। পার্কের অন্যদিকে বিশৃঙ্খল পাইন-ফার-চেরী গাছের জটলা।

নতুন বাড়িতে পৌঁছোনোর প্রথমদিন জিনিসপত্র সাজাতে-গুছোতেই চলে গেল। অ্যাপার্টমেন্টটা ভালোই। একটা বড় ড্রয়িংরুম, সঙ্গে একটা রান্নাঘর। দুটো বড় শোবার ঘর, একটা বাথরুম, আর খানিকটা প্যাসেজ।

সেদিন রাতে বেশ গাঢ় ঘুম এল। সারাদিন যা ধকল গেছে—আসারই কথা। কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রাত তিনটে নাগাদ। কীসের যেন আওয়াজ পেলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আওয়াজটা ট্রিল্যাঙ্গের কাছ থেকে আসছে। যখনই কোনও সঙ্কেত আসে ট্রিল্যাঙ্গে একটা বিপ বিপ শব্দ হয়—পেজারের মতো। কিন্তু এত ঘন ঘন বিপ শব্দ আসার কোনও কারণই পেলাম না। বিশেষত এত রাতে। ঘরের বাইরেই একটা গাছ আছে। তার থেকেই আসছে হয়তো। উঠে ট্রিল্যাঙ্গটা হাতে নিলাম। সঙ্কেতগুলো পড়লাম। তারমধ্যে প্রথম দশটা এ চিঠিতে লিখছি। তুমি বুঝতে পারবে সঙ্কেতগুলো কত বিস্ময়কর।

এক ঃ লোকটাকে চিনতে পেরেছ তো? এর খবরই পেয়েছিলাম।

দুই ঃ চিনতে পারিনি আবার? চাপদাড়ি, ছ'ফুট লম্বা। চোখের নীচে কালো জরুল। সবই মিলে যাচ্ছে। তা ছাড়া ওই যন্ত্রটা! ওরকম যন্ত্রের কথাই তো শুনেছিলাম!

তিন ঃ ওতে নাকি আমাদের ছবি তোলা যায়। ওটা দিয়ে ওই লোকটা

আমাদের মারার নানান চক্রান্ত করে।

চার ঃ তাই নাকি? তাহলে তো ওই যন্ত্রটা নষ্ট করে দেওয়া উচিত।

পাঁচ ঃ তা আর বলতে? শুধু তাই নয়, দেখতে হবে কীভাবে ওই লোকটাকেও মারা যায়। এজন্য আমাদের সবাইকে সঙঘবদ্ধ হতে হবে।

ছয় ঃ চল, লোকটার সঙ্গের বেতের চেয়ারের সঙ্গে আলাপ করা যাক। হয়তো কাজে আসবে..., কী হে, কদ্দিন আছ লোকটার সঙ্গে?

সাত ঃ বছর তিনেক। তার আগে এক জিউ পরিবারের সঙ্গে ছিলাম। একটা পুরোনো জিনিসের দোকান থেকে লোকটা আমাকে কিনেছিল।

আট ঃ তা লোকটা তোমার সঙ্গেও বাজে ব্যবহার করেছে নিশ্চয়ই।

নয় ঃ তা আর বলতে! আশি কেজি ওজন। যখনই ওপর থেকে কিছু নামানোর দরকার হয়, আমার ওপরে ওঠে। একদিন গায়ে গরম চা-ও উলটে ফেলেছিল।

দশ ঃ তাহলেই ভাবো! আচ্ছা, লোকটার সঙ্গের ওই যন্ত্রটা খুব খারাপ শুনেছি। এ ব্যাপারে কিছু জানো?

এই হল প্রথম দশটা সঙ্কেতের অনুবাদ। আমি বাকিগুলো আর লিখছি না। সেগুলো এরকমই কথোপকথন। তবে এর মধ্যে সবথেকে অস্বাভাবিক ব্যাপারটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।—হ্যাঁ, আমি বেতের চেয়ারটার কথাই বলছি।

অনেকটা রূপকথার গল্পের মতো না?

কিন্তু বিশ্বাস করো, ট্রিল্যাঙ্গে ফুটে ওঠা ওই লেখা থেকেই ধারণা করলাম দুই আলাপচারী কে হতে পারে। ওরা ঘরের চারধারের দেওয়াল বা ঘরে রাখা কাঠের তৈরি অন্য কোনও জিনিস। কারণ, শুধু গাছ নয়, গাছের কাঠে তৈরি সব জিনিসেই প্রাণস্পন্দন থাকে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদজগতে প্রাণের সব স্পর্শ হারিয়ে যায় না।

তুমি হয়তো এসব পড়ে হাসবে। কিন্তু আমার এ বিষয়ে কোনও দ্বিধা নেই। কেন নেই তা তুমি বাকিটা পড়লেই বুঝবে।

আমার বাকি রাতটা না-ঘুমিয়ে কেটেছিল। মনে হচ্ছিল যেন চারদিক থেকে অনেকগুলো চোখ নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আর ষড়যন্ত্র করছে।

শেষ রাতের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছিল। ভারী খারাপ একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম। খাটটা আমাকে পেঁচিয়ে ধরেছে। আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছি না। দমবন্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ঘামে জামা ভিজে গেছে। ট্রিল্যাঙ্গটা টেবিলের উপর রেখেছিলাম। দেখলাম সেটা মাটিতে পড়ে গেছে।

অত দামি যন্ত্র, খারাপ হল কিনা উঠে দেখতে গেলাম। ঠিক তাই। গ্রাহক যন্ত্রের কয়েকটা চিপ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পড়ল কীভাবে? আমি তো টেবিলের মাঝখানে রেখেছিলাম। তাহলে কি টেবিলটাই ট্রিল্যাঙ্গটাকে ফেলে দিল?

টেবিলটার উপর হাত দিতেই একটা তীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহ আমার মধ্যে দিয়ে চলে গেল।

তাহলে কি এবার আমার পালা? নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড খুব বেড়ে গেছে মনে হল। পাদুটোকে কাঠের মেঝেটা কেমন যেন টেনে ধরছে।

শরীরের সব শক্তি একত্র করে বাইরের দরজার দিকে এগোতে থাকলাম। প্যাসেজের ওপর দিকে একটা কাঠের ক্যাবিনেট ছিল। হঠাৎ সেটা সশব্দে ভেঙে পড়ল। হাতে সামান্য চোট লাগলেও, বলা যায় ভাগ্যজোরে বেঁচে গেলাম। আরেকটু হলে মাথার ওপর পড়ত।

ড্রয়িংরুমে এসে দরজার লক খুললাম। কিন্তু দরজা তবু খোলে না। বেশ খানিকক্ষণ পাগলের মতো টানাটানি করার পর খুলল। দেখলাম কাঠের পাল্লার ফাঁকে একটা ছোট কাঠের কুচি ঢুকে এই বিপত্তি ঘটিয়েছে।

বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে নিশ্বাস নিয়ে যেন বাঁচলাম। আহ্, সবক'টা জীবন্ত আসবাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। আপাতত নিশ্চিন্ত।

কিন্তু তখনই খেয়াল হল, চারধারেই তো গাছ। পায়ের তলায় মোলায়েম ঘাসের ছোঁয়া। এরাও কি ষড়যন্ত্রে সামিল নাকি?

আর একমিনিটও না দাঁড়িয়ে টয়োটা ক্যামরি গাড়িটাকে নিয়ে কলম্বাস সায়েন্স রিসার্চ সেন্টারের দিকে এগোলাম।

ওখানে ডক্টর ফার্গুসন আর জয়েস মুলানকে রাতের ব্যাপারটা ও আমার গবেষণার কথা খুলে বললাম। ট্রিল্যাঙ্গের সঙ্কেতগুলো দেখালাম। ওঁরা

হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

ঘরে আমাকে আটকে মারার কীভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল তাও বললাম। বিশ্বাস করা তো দূরস্ত, আমার ওইসব কথা ওনাদের আরো হাসির খোরাক জোগাল। বুঝলাম এঁদের বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। বিজ্ঞানে প্রচলিত ধারণার বাইরে অন্য কোনও কিছু ভাবা ওঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য। আর তখনই মনে হল তোমার কথা। তুমি বলতে অত্যন্ত অবাস্তব কল্পনাও একদিন সত্যি বলে প্রমাণিত হতে পারে।

চিঠি এখানেই শেষ করছি। ভালো থেকো। আমি জানি না ওদের এই ষড়যন্ত্র থেকে আমি রেহাই পাব কিনা। আমি চাই অন্তত পৃথিবীর একজনকে আমাদের আসন্ন বিপদের কথা বলে যেতে। গাছ কেটে ঘরে ঘরে কাঠের আসবাব তৈরি করে আমরা কীভাবে আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনছি। ভাবতে পারো, কী হবে যদি পৃথিবীর এই কোটি কোটি গাছ একত্র হয়ে আমাদের আক্রমণ করে?



ডঃ লিওনার্ড ও অ্যালোপেশিয়া

শীতের দুপুর। আমরা সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামদার ফুচকা খাচ্ছি। অনিলিখা এমনিতে খুব স্বাস্থ্যসচেতন হলেও ফুচকা খাওয়ার সময় কোনওদিন 'না' বলে না। তেরো নম্বর ফুচকাটা খেতে খেতে হঠাৎ সাগ্নিক একটা রিকশার দিকে হাত নাড়িয়ে 'সৌরীশ' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

রিকশা থেকে একটা চশমা পরা ছেলে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দেখে হাত নেড়ে উঠল।

রিকশাটা চোখের আড়াল হতে না হতেই সাগ্নিক বলে উঠল,—সৌরীশ আমার সঙ্গে পড়ে। ও না বর্ণান্ধ! আমরা কেউই জানতাম না। সেদিন ট্রেনের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছি, দেখি বারবার ও লালকে সবুজ আর সবুজকে লাল বলে ভুল করছে। পরে কথায় কথায় জানলাম ও নাকি বর্ণান্ধ। খুব ছোটবেলায় কালীপুজোয় বাজি ফাটাতে গিয়ে চোখে তুবড়ির

ফুলকি এসে পড়ে। তারপর থেকেই নাকি ও এরকম।

বর্ণান্ধতা তো বংশগত রোগ। ওভাবে তো হতে পারে না।—ফুচকাটা মুখে থাকা অবস্থাতেই অনিলিখা বলে ওঠে।

কিন্তু!—কিছু একটা বলতে গিয়ে সাগ্নিক চুপ করে গেল। আমাদের কারোরই অনিলিখার কোনও কথার ওপর কথা বলার সাহস হয় না। বারবার ওর নির্ভুলতার প্রমাণ পেয়েছি।

তা তোমার এ ব্যাপারে অনেক কিছু জানা আছে মনে হয়!—বিশ্বজিৎদা কথাটা বলেই বিড়বিড় করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতা আবৃত্তি করছিল।

হঠাৎ ওকে থামিয়ে দিয়ে অনিলিখা বলে ওঠে,—হ্যাঁ, কিছুটা। আর এ ব্যাপারে কথা হলেই ডঃ লিওনার্ডের কথা মনে পড়ে।

ডঃ লিওনার্ড? নিশ্চয়ই তোমার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির কোনও এক প্রফেসার।—বলে উঠি।

—না, লিওনার্ড হার্ভার্ডে পড়াতেন না, উনি বেসরকারি কোন এক রিসার্চ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তা ফুচকা খাওয়া শেষ করে ঘরে বসে গল্পটা করলে হয় না?

অনিলিখার কথাতে আমরা সায় দিই। তাড়াতাড়ি ফুচকা শেষ করে মিনিট দশেক পরে অর্ণবের বাড়িতে জমায়েত হই, অনিলিখার মুখে ডঃ লিওনার্ডের কথা শুনতে। রোজ রোজ তো আর এ সুযোগ হয় না!

—হার্ভার্ডে পড়ার সময় আমি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে ডঃ লিওনার্ডের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করেছিলাম। পড়াশোনার খরচ চালাতে মাঝে মাঝে এরকম নানান ধরনের কাজ করতে হত। শুধু স্কলারশিপের টাকায় তো আর ভালোভাবে চলে না! একদিন সকালের কাগজে 'কাজের সন্ধানে'-তে চোখ বোলাতে গিয়ে দেখি এক ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের দরকার। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি ছেড়ে দিলাম।

কয়েকদিন বাদে ডাক পড়ল। ইউনিভার্সিটি থেকে ফোনে পাওয়া ঠিকানাটা ঘণ্টাখানেকের পথ। বাগান দিয়ে ঘেরা লিওনার্ডের বাড়িটা মূল শহরের বাইরে। খানিকটা নিরালা জায়গাতে। আটটার সময় আমার

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। পৌঁছোতে আটটা পাঁচ হয়ে গেল। দরজায় নক্ করতেই মাঝবয়সি অসম্ভব সুদর্শন এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। দেখতে ঠিক আমেরিকানদের মতো নয়। ইউরোপীয়ানদের মতো টিকোলো নাক, চোখ, মুখ; দোষের মধ্যে মাথা জুড়ে বিশাল টাক। তা তাতে লিওনার্ডকে ভালোই মানিয়েছে।

আপনিই নিশ্চয় অনিলিখা? আমিই ডঃ লিওনার্ড।—করমর্দন করে আমাকে ড্রয়িংরুমের সোফাতে বসতে অনুরোধ করলেন।

—পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেছে। আমার এখানে কিন্তু ঠিক সময়মতো আসতে হবে।...তা আপনি এখন কী করছেন?

—আমি হার্ভার্ডে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি।

—বাঃ, তা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আপনার পড়াশুনো আছে?

—না, কিছুই নেই, আপনার বিজ্ঞাপনে তো সেরকম কিছু উল্লেখ ছিল না।

না, তাতে অবশ্য আমার কোনও অসুবিধে হবে না।—ভদ্রলোক, আমার ওই বিষয়ে কিছু না-জানা থাকাতে বরং খুশিই হলেন মনে হল।

—আমি বর্তমানে একটা বেসরকারি মেডিকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অনুদানে গবেষণা চালাচ্ছি। কিন্তু আমার অসুবিধে হল আমাকে অন্যান্য নানান কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই গবেষণার দৈনিক অগ্রগতি দেখার জন্য একজন ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের প্রয়োজন।...একটা কথা এক্ষেত্রে পরিষ্কার জানিয়ে রাখি। গবেষণার যাবতীয় তথ্য অত্যন্ত গোপনীয়। এ বিষয়ে কাউকে কোনও কথা বলা চলবে না। মাসখানেকের জন্য আমার দরকার। আপনি রাজি?

—তা আমার কাজটা কী হবে?

আসুন কাজটা বুঝিয়ে দিই।—বলে লিওনার্ড আমাকে নিয়ে সংলগ্ন করিডোর দিয়ে হেঁটে বাঁদিকের একটা ঘরে ঢুকলেন। ল্যাবরেটরি। বিশাল ঘর। নানা ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সাজানো। একদিকে রাখা সারি সারি টেস্টটিউব দেখিয়ে লিওনার্ড বলে উঠলেন,—প্রত্যেকটার মধ্যে ভ্রূণ রাখা আছে। দু-সপ্তাহ থেকে তিনসপ্তাহের মধ্যে এগুলোর বয়েস। কোনওটাই

স্বাভাবিক নয়। প্রত্যেকটার জিনেই কোনও না কোনও দোষ আছে। বিভিন্ন ধরনের বংশগত রোগ নিয়ে এসব শিশু ভূমিষ্ঠ হবে। গভর্নমেন্টের ভ্রূণব্যাঙ্ক থেকে পরীক্ষার জন্য এই ভ্রূণগুলো কেনা হয়েছে। এগুলোর ওপরেই আমার গবেষণা চালাব। বুঝতে পারলেন?

খুব বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লাম।

লিওনার্ড ফের বলে উঠলেন,—এই ভ্রূণগুলোর ওপর সময়মাফিক কিছু ওষুধ প্রয়োগ করা এবং এদের ওপর সেই ওষুধের প্রভাব লক্ষ করাই হবে আপনার কাজ। আপনি সেগুলো নোটবুকে লিখে রাখবেন। আমি এসে দেখব।

এরপর উনি ওঁর পরীক্ষাপদ্ধতি আর কীভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে সব বুঝিয়ে দিলেন।

কাজটা খুবই সোজা। আর তা ছাড়া আমার মুখ্য আকর্ষণ যেটা—সেই টাকার অঙ্কটা বেশ ভালোই।

পরের দিন থেকেই আমার কাজ শুরু।

প্রথম দিন লিওনার্ড বাড়িতেই ছিলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে নিয়মমাফিক ওষুধ প্রয়োগ করলেন আর কীভাবে চার্ট করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য লিখতে হবে, সেটা বলে দিলেন।

খুবই ভারিক্কী প্রকৃতির মানুষ। প্রয়োজনের বাইরে একটা কথাও বলেন না।

আমার কাজ আপাতত শুধু একটা ভ্রূণের ওপর। কাজটা অবশ্য খুব মানবিক নয়। লিওনার্ডের ওষুধের প্রয়োগে ওই ভ্রূণের মৃত্যুর কথা। আর সেটা লক্ষ রাখাই আমার কাজ।

দু-দিন এভাবে কেটে গেল। বলার মতো কিছু নেই। কাজের মধ্যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানান যন্ত্রপাতি দিয়ে ভ্রূণটাকে দেখে রিপোর্ট লেখা।

তৃতীয় দিন সন্ধে আটটা নাগাদ ভ্রূণটা মারা গেল। নোটবুকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য লিখে রাখলাম।

মনের মধ্যে একটা আনন্দের রেশ দেখা দিল। এ ক'দিন লিওনার্ডকে খুবই চিন্তিত হয়ে থাকতে দেখেছি।

পরে অবশ্য খারাপই লেগেছিল একটা শিশুর প্রাণকে অকালে স্তব্ধ করেছি ভেবে। হতে পারে যে সেই শিশুর কোনও বংশগত রোগ থাকত। কিন্তু আর সবদিক দিয়ে তো প্রাণের. প্রতিশ্রুতি ছিল তাতে।

ঘণ্টাখানেক বাদে লিওনার্ড এলেন। লিওনার্ডকে খবরটা দিতে খুব খুশি হয়ে আমার পর্যবেক্ষণের যাবতীয় তথ্য জানতে চাইলেন।

নোটবুকটা এগিয়ে দিলাম। নোটবুকের ওপর চোখ বুলিয়ে লিওনার্ড হঠাৎ বলে উঠলেন,—আপনার এই গবেষণার বিষয়ে সামান্য জানা দরকার। নোটবুক পড়ে মনে হচ্ছে যেন একটা বাচ্চার মৃত্যুর কথা লিখেছেন। আপনি আসলে লিখেছেন একটা অসুস্থ ভ্রূণহত্যার কথা। আপনি নিশ্চয়ই জানেন দেশবিদেশের বিজ্ঞানীরা মানুষের শরীরের ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোমের সম্পূর্ণ গঠন জানার চেষ্টা করছে। কিন্তু ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোমের সম্পূর্ণ গঠন জানা মানে, প্রায় এক লক্ষ জিন বা ষাট কোটি নিউক্লিওটাইডের গঠন জানা। তারা কী পর্যায়ক্রমে আছে তা জানা। এইসব জিনের সামান্য খুঁতের জন্যে ভ্রূণের মধ্যে দোষ দেখা যায়, যার জন্য শিশু বংশগত কোনও রোগ নিয়ে জন্ম নেয়। কিন্তু কোন রোগের জন্য কোন জিনের কী খুঁত দায়ী, তা জানা দুঃসাধ্য। জিনের যে দোষের জন্য সিস্টিক ফাইব্রোসিস হয়, তা জানতে প্রায় এককোটি ডলার খরচ করা হয়েছিল। বুঝতেই পারছেন, এভাবে ভ্রূণের প্রত্যেকটা দোষের জন্য কারণ বার করা অনেক সময় ও খরচ সাপেক্ষ!

আমি থতমত খেয়ে সায় দিতে লিওনার্ড ফের শুরু করলেন,—আমার আবিষ্কৃত ওষুধ সেখানে অনেক উন্নতমানের। প্রথমে এই ডিটেকটার, ডি.এন.এ. স্ট্রান্ডের ঠিক কোথায় গণ্ডগোল তা খুঁজে বার করে। এবং স্ট্রান্ডের সেই জায়গায় ডিটেকটারের খানিকটা অংশ আটকে যায়। ডিটেকটারের বাকি অংশ ডি.এন.এ. স্ট্রান্ডের টেলোমারকে খুঁজে বার করে। এই টেলোমার ডি.এন.এ.-র টুপির মতো কাজ করে বিভাজন প্রক্রিয়ার সময় রক্ষা করে। আমার ডিটেকটার টেলোমারের ওপর কাজ করে ডি.এন.এ.-র রেপ্লিকেশন বন্ধ করে দেয়। খানিকক্ষণের মধ্যে পুরো ভ্রূণ নিউক্লিওটাইডে ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়।

—কিন্তু এতে লাভ কী?

লাভ?—লিওনার্ড আমার অজ্ঞতায় অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালেন।

—প্রত্যেক বাবা-মাই চান তাঁদের সন্তান সবদিক দিয়ে স্বাভাবিক হোক, সুস্থ হোক। আমার এই ওষুধের সাহায্যে পৃথিবীতে অসুস্থ কোনও শিশুর জন্ম বন্ধ করা যায়।

—কিন্তু এভাবে তো পৃথিবীতে কোটি কোটি নিরীহ শিশু হত্যা করা হবে।

আঃ, আপনি আবার ভুল করছেন।—লিওনার্ডের মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে ঃ আমরা শিশু নয়, ভ্রূণ হত্যা করছি। প্রথম দু-মাস অবধি আমরা 'এমব্রায়ো' বা ভ্রূণ বলি। এরপর জন্মানোর আগে অবধি 'ফেটাস' বলি। আর জন্মানোর পর শিশু বলি। আমার ওষুধ যখন ভ্রূণের ওপর কাজ করে, তখন তাকে কোনওভাবেই শিশু বলা যায় না। তখন তা সামান্য কিছু কোষের সমষ্টি মাত্র। নষ্ট হওয়া ভ্রূণ পেশীর অন্যান্য কোষের মধ্যে মিশে যায়।

লিওনার্ড আমার হাতে 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান'-এর একটা সংখ্যা দিয়ে বললেন,—পড়ে দেখুন। কত অসুস্থ শিশুর কথা এতে আছে। এদের কথা ভাবলেই কষ্ট হয়। অনেকক্ষেত্রে এদের বাঁচিয়ে রাখা মানে এদেরকে কষ্ট দেওয়া। আমাদের প্রায় পাঁচহাজার রকম অসুখের জন্য দায়ী ডি.এন.এ.-র খুঁত। আমার এই প্রোজেক্টে অবশ্য এই পাঁচহাজার রকম ডি.এন.এ.-র উপর আমার ওষুধের কার্যকারিতা দেখব না। আমি শুধু দশরকম অস্বাভাবিক ডি.এন.এ.-র ওপর এখন পরীক্ষা করছি। যদি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমার ওষুধ সফল হয়, অর্থাৎ ভ্রূণ মারা যায়, তাহলে আমি আরো কয়েকশো ডিফেক্টিভ জিনের ওপর চেষ্টা করব। তাতে সফল হলে ঘরে ঘরে এ ওষুধের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়বে।...তা এই প্রোজেক্টের বাকি ক'টা ভ্রূণে কী কী ধরনের দোষ আছে জানতে ইচ্ছে করছে?

মাথা নাড়তে লিওনার্ড বলে উঠলেন,—এর পরের টেস্টটিউবের ভ্রূণে আছে বর্ণান্ধতার ডি.এন.এ.। পরেরটাতে বাঁ-হাতি হবার জন্য দায়ী ডি.এন.এ.। তৃতীয় টিউবে অ্যালবিনোর ভ্রূণ। এতে শরীরের চামড়া পুরো সাদা হয়ে

যায়। চার নম্বর টিউবে এ.এল.এস.—অ্যামিওট্রফিক ল্যাটারাল সক্লেরোসিস। পাঁচ নম্বর টিউবে সিস্টিক ফাইব্রোসিস। ছয় নম্বরে মাসকুলার ডিসট্রফি। সাতনম্বরে সিক্‌ল সেল সিনড্রোম। আট নম্বরে...।

ভদ্রলোক বলেই চললেন।

—আমরা এগুলোর ওপর এবার একসঙ্গে পরীক্ষা চালাব। যদি এই ডিটেকটার প্রোগ্রাম সফল হয়, তাহলে সারা মনুষ্যজাতিটাকে যে-কোনও বংশগত রোগের হাত থেকে মুক্ত করা যাবে।

অর্থাৎ ওদেরকে ভ্রূণ অবস্থাতেই মেরে ফেলা যাবে।—মনে মনে বলে উঠি।

ওদিকে লিওনার্ড খুব উত্তেজিত হয়ে মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে নিয়েছেন। বিস্তৃত টাকটা ঘরের আলোয় চকচক করে উঠল।

—আর কাজ যদি না করে?

লিওনার্ড একটা টেস্টটিউব হাতে তুলে দেখতে দেখতে বলে উঠলেন,—আমাদের পাইলট প্রোজেক্ট কাজ না করলে, কী হবে বলা মুশকিল। তাহলে হয়তো জিনের কীভাবে পরিবর্তন করে খুঁতটা সারিয়ে তোলা যায়, তার চেষ্টা করতে হবে। তবে তাতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বহু বছর লাগবে, আর কত কোটি ডলার লাগবে বলা সম্ভব নয়। হয়তো আমি রিসার্চ করার জন্য অত অনুদান পাবও না। তবে এই যে একটাতে আমি সফল হলাম, তাতেই আমি অনেক নিশ্চিন্ত। নির্ঘাত বাকিগুলোর ক্ষেত্রেও আমার ওষুধ কাজ করবে। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান। প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি লিখে রাখবেন।

আরও খানিকক্ষণ কাজের কথা হল। তারপর থেকে আমাদের কাজ শুরু হল বাকি ভ্রূণগুলোর ওপর।

এভাবে দেখতে দেখতে তিন সপ্তাহ কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যায় ডঃ লিওনার্ডের সঙ্গে ফের মুখোমুখি হলাম। নোটবুক দেখে বলে উঠলেন,—একটাও মরেনি? ন'টাই বেঁচে আছে?

—হ্যাঁ, ডঃ লিওনার্ড। প্রত্যেকটা ভ্রূণই বেড়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবে।

—দেখা যাক, হয়তো আমার ওষুধটা কাজ করতে সময় নিচ্ছে। আরো

দু-সপ্তাহ দেখা যাক। ভ্রূণগুলো ততদিনে একইঞ্চি লম্বা মানুষে পরিণত হবে। ওদের ততদিনে চোখ হবে। হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকপুকুনি শুরু হবে, স্নায়ুতন্ত্র গড়ে উঠবে। ততদিনেও যদি ডিটেকটার কাজ না করে, তাহলে আর কোনদিনই কাজ করবে না।

আরও দু-সপ্তাহ কেটে গেল। ভ্রূণগুলো সবই বেঁচে আছে। ডঃ লিওনার্ড সোফার ওপর আমার নোটবুক হাতে নিয়ে শুকনোমুখে বসে ছিলেন। থমথমে পরিবেশটা কাটানোর জন্য বলে উঠলাম,—আর কী করা যায়?

আমার নিজেরও প্রশ্ন করতে গিয়ে খুব খারাপ লাগছিল।

—আর কী? আমার ওষুধ কাজ করলে ভ্রূণগুলো এতদিন বেঁচে থাকত না। নাঃ, এ নিয়ে আর সময় নষ্ট করা বৃথা। আমাদের ডি.এন.এ. সংশোধনের প্রোগ্রামের কথাটাই ভাবতে হবে। তবে তার জন্য বিরাট অনুদানের অপেক্ষায় থাকতে হবে। যতদিন না অনুমোদন পাচ্ছি, ধরে নিতে হবে আমার প্রোজেক্ট বাতিল।

—তা কোনটার ওপর সেটা করার কথা ভাবছেন?

—বর্ণান্ধতার ওপর। বর্ণান্ধের সংখ্যা তো কম নেই পৃথিবীতে। তবে আমার অনুমান এ বিষয়ে গবেষণা করতে কয়েক কোটি ডলারের প্রয়োজন। অতটাকা রিসার্চের জন্য স্পনসর করতে কোন সংস্থা এগিয়ে আসবে কে জানে?

খানিক থেমে লিওনার্ড ফের বলে উঠলেন,—আচ্ছা, প্রথম ভ্রূণটাতে—যেটাতে আমার ডিটেকটার সফল হয়েছিল, ডি.এন.এ.-র কী দোষ ছিল যেন? ওটার জন্য তো আমার ওষুধ ব্যবহৃত হতে পারে—তাই না?

লিওনার্ডের চোখে আশার ঝিলিক দেখি।

অ্যালোপেশিয়া। মাথায় অকালে টাক পড়া। তার মানে আজ থেকে টাকপড়া লোকেদের পৃথিবী থেকে বিদায়।—কথাটা বলেই চোখ পড়ল ডঃ লিওনার্ডের ওপর। উনিও হয়তো একই কথা ভাবছিলেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। ওঁর মাথায় বিস্তৃত টাকটার দিকে তাকিয়ে।

অনিলিখা এতটা বলে যথারীতি হঠাৎ করে থেমে গেল। মিনিট দুয়েক নীরব আছে দেখে বলে উঠলাম,—তা ডঃ লিওনার্ডের পরবর্তী গবেষণার

কী হল?

—জানি না। ওই প্রোজেক্ট শেষ হয়ে যাবার পর আমি আর ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। উনিও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। কী জানি, পরে উনি আমার কারচুপিটা বুঝতে পেরেছিলেন কিনা।

কারচুপি?—আমরা প্রায় একসঙ্গে বলে উঠি।

—ওরই তৈরি ডিটেকটার নিউট্রালাইজার বা ওঁর ওষুধকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া ওষুধটা আমার চোখে পড়েছিল। ওটা অন্য জায়গায় রাখা ছিল। আমি বাকি সবক'টা ভ্রূণে সেটা মিশিয়েছিলাম। আর সেটা যদি না করতাম সৌরীশরা হয়তো এতদিনে পৃথিবী থেকেই উধাও হয়ে যেত।



স্বামী ভবানন্দ রহস্য

স্বামী ভবানন্দজি। অদ্ভুত ক্ষমতা, তাই না!—মিলন বলে উঠল। হ্যাঁ, এরকম গ্যারান্টি দিয়ে ঈশ্বরদর্শন করানো! ভাবা যায়?

আসলে বলাটাই বড় কথা নয়, করেও তো দেখাচ্ছেন। যে-ই যায় ওর কাছে সে-ই তো পালটে যাচ্ছে। এই তো ম্যাজিশিয়ান মল্লিক অনেক হম্বিতম্বি করে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন ভন্ডামি-অপকীর্তি সব ফাঁস করে দেবেন। তা একমাস বাদে ফিরে এলেন 'বাবা-বাবা' বলতে বলতে। শুনছি ম্যাজিকও ছেড়ে দিচ্ছেন। বাকি সারাজীবন গুরুর বাণী প্রচার করে আর জনসেবায় কাটাবেন বলছেন।

দেখেছ কাগজে রোজ ভবানন্দজির ওপর একটা লেখা থাকবেই। আমার মনে হয় মিডিয়ার সঙ্গেও ওর দারুণ যোগাযোগ আছে।

তা তো হবেই। বড় বড় সব নেতা-আমলারা ওনার শিষ্য। আর ওনার

কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্যও বিশাল ওয়েটিং লিস্ট। স্বামীজি নাকি কয়েকশো নামের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে বেছে নেন। তাও আবার বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় ছাড়া দীক্ষা দেন না।

অদ্ভুত তো! তা লোকটাও খুব ভালো শুনেছি। ওনার কথা শুনে তো তাই মনে হয়।

লোক বলিস না বাবা, ওঁরা হলেন মহাপুরুষ।'—মাসিমা বলে উঠলেন। 'আমরাও এক বছর ধরে অপেক্ষায় আছি। কখন স্বামীজি ডাকেন। ভাগ্যে থাকলে হবে।'

'আমি গত সপ্তাহে ডাক পেয়েছি মাসিমা। আগামি সপ্তাহে যাচ্ছি।' বিশ্বজিৎদা বলে উঠল, 'ন'মাস অপেক্ষা করে'। আমরা সবাই চমকে উঠলাম। এতবড় খবরটা বিশ্বজিৎদা এতক্ষণ বলেনি।

'সত্যি, ভাগ্য করে এসেছিস বিশ্ব। তা না হলে এরকম স্বামীজির কাছ থেকে ডাক পাস।'—মাসিমা বলে উঠলেন। আমরাও সবাই তাতে যোগ দিলাম। এই প্রথম আমাদের চেনা কেউ স্বামীজির দর্শন পেতে চলেছে।

তোমরা যারা আমাদের শনিবারের আসর সম্বন্ধে পরিচিত নও, তাদের জানাই প্রত্যেক শনিবারে উত্তর কলকাতার রামতনু বোস লেনের এক বাড়িতে আমরা জনা কুড়ি কিশোর-কিশোরী জমায়েত হই। বিজ্ঞান, সাহিত্য, মেলা, সিনেমা কোনও কিছুই আমাদের আলোচনা থেকে বাদ যায় না।

তা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় স্বামী ভবানন্দজি। গত একবছরে স্বামী ভবানন্দজির নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু ভারতে কেন ভারতের বাইরে থেকেও অনেকে ওনার কাছে দীক্ষা নিতে আসেন। স্বামীজির দীক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিটাও ভারী অদ্ভুত। প্রায় একমাস ধরে এই দীক্ষা পর্ব চলে। হয় বছরের বিশেষ কিছু সময়ে। বেছে বেছে নেন।

লক্ষাধিক ভক্তের মধ্যে সামান্য কয়েকজন স্বামীজির কাছে দীক্ষা নেবার সুযোগ পায়। আর যারাই ওনার সংস্পর্শে আসে তাদের মধ্যে বিশাল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিখ্যাত অ্যাডভোকেট রামকুমার শেষাদ্রি, ইএনপি সফ্‌টওয়্যার সার্ভিসেসের প্রধান রবি উনি, ক্রিকেটার ভরত শেঠ, হোম মিনিস্টার রাহুল সরকার—সবার মধ্যেই এক বিশাল মিল। এঁরা সবাই স্বামীজির শিষ্য। স্বামীজির কাছে দীক্ষা নেওয়ার পরে এদের কেউ কেউ

তাঁদের পেশার থেকে সরে এসে পুরোপুরি জনসেবায় যুক্ত হয়েছেন, কেউ পুরো সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। স্বামীজির কথায় প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন, আর উনি সেই ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে সাহায্য করেন।

'তা বিশ্বজিৎদা তুমি কবে যাচ্ছ? দারুণ এক্সাইটেড নিশ্চয়ই?'—রাতুল বলে ওঠে।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে এখনও কুড়ি দিন বাকি আছে।'

'তা তুমি এত ধার্মিক হলে কবে থেকে?' শিশির বলে ওঠে।

'আরে আমি থোড়াই যাচ্ছি সেরকম ভক্ত হতে। আসলে এরকম পরিবর্তন এ'কদিনের মধ্যে কীভাবে হওয়া সম্ভব সেই কৌতূহলটাই আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

'বিশ্বজিৎদা থেকে স্বামী বিশ্বানন্দজি'—অনিলিখা এতক্ষণ চুপ করে ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। হঠাৎ করে খোঁচা দিল।

কটমট করে অনিলিখার দিকে একবার তাকিয়ে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল, 'আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করাটা অত সোজা হবে না। আমার বিশ্বাস এর পিছনে একটা বড় কোনও চক্র কাজ করছে। এই যে চক্রধরপুর—এর কথা কেউ আগে কোনওদিন জানত? এখন শুধু স্বামীজির জন্যই লক্ষ লক্ষ লোক ওখানে আসতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ইয়ংগার জেনারেশন—চল্লিশের কমবয়সিদের স্বামীজি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। স্বামীজির প্রভাবে ওই অঞ্চলে হিংসার ঘটনাও অনেক কমে গেছে।

'তা এতে অস্বাভাবিক কি আছে?'

'অস্বাভাবিক আছে বইকি! অন্য কোনও গুরু, মুনি-ঋষি যা পারলেন না, হঠাৎ করে ইনি করছেন কি করে? তাছাড়া আর কোন গুরুকে নিয়ে এত লেখালেখি হতে দেখেছিস? কাউকে ঘিরে এত বড় বড় নেতাদের ভিড় দেখেছিস? আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটার পিছনেই সরকার আর প্রচার মাধ্যমের প্রত্যক্ষ মদত আছে। আর তা-ই আমার যাওয়া।'

'তা ওখানে কতদিন থাকতে হবে?'

'একমাস তো থাকতেই হবে। পুরো দীক্ষার প্রসেসটাই চলবে একমাস ধরে। তারপরে আমার আরো দিন চার পাঁচ থাকার ইচ্ছে আছে।'

'তার মানে বিশ্বজিৎদা তুমি বেশ কয়েক সপ্তাহ আর এখানে আসছ না?'

'আমি না থাকলেই বা কি। অনিলিখা তো আছেই। ওর কাছেই গল্প শুনিস তোরা'। অনিলিখাকে নিয়ে বিদ্রুপ করার সুযোগ পেলে বিশ্বজিৎদা ছাড়ে না। আজকের বাকি সময়টাও ভবানন্দজি, আর বিশ্বজিৎদা কিভাবে যাবে, কি প্রস্তুতি নেবে—সেসব নিয়ে আলোচনায় কেটে গেল।

২

আমরা আবার তিনমাস বাদে শনিবারের আসরে বিশ্বজিৎদাকে ফিরে পেয়েছি। অনিলিখাও আছে। বিশ্বজিৎদা ছিল না বলে যে আমাদের শনিবারের জমায়েত বন্ধ ছিল তা নয়। তবে অনেকটাই স্বাদ হারিয়েছিল। অনিলিখাও এরমধ্যে মাত্র একদিন এসেছিল। তাই দুই চন্দ্র-সূর্যের অভাবে আমাদের আসর একেবারেই টিমটিমে হয়ে পড়েছিল।

বিশ্বজিৎদা প্রায় একমাস হল ফিরেছে। কিন্তু ফেরার পর থেকে আর আমাদের আসরে আসেনি। তা ছাড়া লোকমুখে খবর পেয়েছি ফেরার পর থেকেই বিশ্বজিৎদা নাকি একেবারে পালটে গেছে। দিনের অনেকটা সময় গীতা-ভাগবৎ পড়ে কাটায়, হালকা কথা বলে না। তাই আরও উদগ্রীব হয়ে বিশ্বজিৎদার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, যাতে পরিবর্তনটার চাক্ষুষ পরিচয় পাই।

ঢোকামাত্রই সে প্রমাণ পেলাম। অন্যদিনের মতো চটিটা ছুড়ে না ফেলে হাতে করে সরিয়ে রাখল। সেরা চেয়ারটায় না বসে, ঘরের এককোণে রাখা টুলটার ওপর কুণ্ঠিতভাবে গিয়ে বসল। আমাদের সবার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করে একবার উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিল যে ও আর আগের মতো নেই। ট্রে-তে রাখা গরম শিঙাড়াগুলোর দিকে শীতল দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। এ যেন অন্য কেউ।

আমাদের অনেক পীড়াপীড়িতে বিশ্বজিৎদা আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল—'স্বামীজির সংস্পর্শে এসে আমি এটাই বুঝলাম যে এতদিন কীভাবে

আমি নষ্ট করেছি।' হাতটা কপালে ঠুকে, চোখ বন্ধ করে প্রণাম করে ফের বলতে শুরু করল,. 'জায়গাটা খুব রিমোট। আগে তো বলতে গেলে যাওয়াই অসম্ভব ছিল, এখন তাও স্বামীজির আশ্রমের জন্য প্রচুর বাস যায়। যদিও তা কোনওভাবেই যথেষ্ট নয়। দেরাদুন থেকে বাসে দেড়ঘণ্টা মতো। সাকরি। তারপরে সেখান থেকে আশ্রমের বাসই নিয়ে যায়। অন্য কোনও বাস বা গাড়িতে যাওয়ার উপায় নেই।

যেদিন পৌঁছোলাম তার দু'দিন পরে প্রথম স্বামীজির দর্শন পেলাম। একদম আর পাঁচজনের মতো চেহারা। কিন্তু চোখ-মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে ইনি সাধারণ নন। একটা অদ্ভুত দীপ্তি, দৃঢ়তা আর প্রশান্তির ছাপ। মুখে সর্বদা স্মিত হাসি। চারপাশের ব্যস্ততা, চাঞ্চল্য থেকে যেন কত দূরে। আমাকে দেখে মৃদু হেসে বলে উঠলেন, কী আবার আমার পরীক্ষা নিতে এসেছিস? তা ভালো, অন্ধ বিশ্বাস ভালো নয়। যাচাই করে নিতে হয়। তবে মনে রাখিস এ তোর নিজেরই পরীক্ষা।

কী করে আমার মনের কথা বুঝলেন জানি না। প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধায় মনটা ভরে উঠল। স্বামীজিকে প্রণাম করে অন্য একটা ঘরে বসলাম। আমারই মতো আরো যারা দীক্ষা নেবে তারা অপেক্ষা করছে। স্বামীজির এক শিষ্য এসে আমাদের সব বুঝিয়ে দিয়ে গেল। আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা জায়গা নির্দিষ্ট আছে যেখানে বসে আমাদের আরাধনা করতে হবে। প্রত্যেকে শুধু দুটো করে জামাকাপড় সঙ্গে নিতে পারবে। দিনে মোটে একবার খেতে পারবে। তাও যৎসামান্য। জলতেষ্টা পেলে পাশের নদী থেকে খেয়ে আসতে হবে। এভাবে একমাস কাটাতে হবে। তবেই না কি আত্মশুদ্ধি হবে। তারপরে হবে দীক্ষা। মনেমনে হাসছিলাম কে কাকে দীক্ষা দেয়!

এরপরে তিনজন শিষ্য আমাদেরকে আরাধনার জায়গা দেখাতে নিয়ে গেল। ভেবেছিলাম বোধহয় কোনও বাড়ির বড় চাতাল হবে। কোথায় কী! পাশে তোরাই নদী। পাহাড়ি নদী। বাঁক নিয়ে নেমেছে। তারই ঠিক পাশে। চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা। তারই মাঝে খানিকটা উপত্যকা মতো। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গুহা। তারই একটাতে আমাকে বসতে হবে। সেটা বড়জোড় পাঁচ-বাই সাত ফুটের মতো জায়গা। পাথরের উপর শুতে হবে।

আমাদের আর নদীর মাঝে, নদীর ধার বরাবর শ্মশান ঘাট। তবে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মড়া পোড়ানো হচ্ছে। জায়গাটা দেখে ভয় পাওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তবু চারদিক এত পরিষ্কার, এত সুন্দর পরিবেশ যে কেন জানি না, ভয় লাগছিল না। চারদিকে তাকালেই মনে হয় এটা দারুণ বেড়ানোর জায়গাও হতে পারত।

৩

পরের দিন থেকে আরাধনা শুরু হল। কোন কথা বলার অনুমতি নেই। যখন-তখন ধ্যান ভেঙে ওঠাও যাবে না। তবু প্রথমদিন মাঝে মাঝেই উঠে হেঁটে আসছিলাম। মনসংযোগ করতে অসুবিধে হচ্ছিল। দূর থেকে ওঁ ধ্বনি, মন্ত্রোচ্চারণ ভেসে আসছে। আমাদের প্রত্যেকের আরাধনার জায়গার মধ্যে প্রায় একশো ফুটের ব্যবধান। সকাল থেকে কোন খাওয়া নেই। সন্ধেবেলা একজন একটা বাটিতে করে ডাল আর রুটি দিয়ে গেল। সারাদিনের খিদে কি আর ওতে মেটে। কিন্তু উপায় নেই। এটাই নিয়ম।

রাতের বেলায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল কেন মরতে এখানে এলাম। চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে আগুন দেখা যাচ্ছে, মড়া পোড়ানোর। আর নদীর জলের আওয়াজ। মাঝে মাঝে নদীর ধারের মন মাতাল করা হাওয়া। কিন্তু পেট জ্বলছে। প্রথম রাতে একটা রীতিমতো মুখরোচক স্বপ্নও দেখলাম।

খিদের চোটে ঘুম তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল। তখনও সূর্য ওঠেনি। হেঁটে নদীর ধার অব্দি ঘুরে এলাম। আমাদের গ্রুপে কয়েকজন বিদেশিও ছিল। তাদের একজনকে পথে দেখলাম। আশেপাশে যে-ক'টা গাছ ছিল কোনটাতেই কোন ফল নেই যে খাব। রোদ একটু উঠতে গুহায় ফিরে এলাম। 'গুরুর বাণী' বলে যে বইটা আমাদের দেয়া হয়েছে বসে বসে পড়তে লাগলাম।

নদীর ধার থেকে মড়া পোড়ানোর ধোঁয়া ভেসে আসছে। তবে আশ্রমের লোকেরাই পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করে, তাই মাঝে মাঝে কাঠ কাটার আওয়াজ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। দুপুরের দিকে নদীর হাওয়ায় আর ক্লান্তিতে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি থালায় মোটা

বাজরার রুটি আর ডাল দিয়ে গেছে। খিদের চোটে তা-ই খুব তৃপ্তি ভরে খেলাম। বিকেলের দিকে এক গুরুভাই জানিয়ে গেল যে সন্ধেবেলা নদীর ধারে একটা জায়গায় গীতাপাঠ হবে—আমি যেন যাই। খানিকবাদে সেখানে পৌঁছে দেখি জনাপাঁচেক ভক্ত গোল হয়ে আগুনকে ঘিরে বসে আছে। চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। তারাখচিত আকাশের নীচে আগুনের আলোয় গীতাপাঠ হচ্ছে। অনির্বচনীয় পরিবেশ। প্রায় ঘণ্টাচারেক গীতাপাঠ হল। তারপর আমরা যে যার মতো গুহায় ফিরে গেলাম। সে রাতে খুব বৃষ্টি হল। সঙ্গে বজ্রপাত। এমন বজ্রপাত আগে দেখিনি। চারদিকের পাহাড় ও গাছগুলো চমকে চমকে উঠছিল বিদ্যুৎ চমকে। ভোরবেলা উঠে দেখি ঠিক সামনেরই একটা গাছে বজ্রপাত হয়েছে। গাছের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। চারদিকের বাতাস অনেক হালকা লাগছে।

এরকম ভাবে দিনের পর দিন কাটতে লাগল। কোনও বৈচিত্র নেই। কিন্তু একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে, নেশা আছে। সারাদিন ধরে গুহায় বসে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, দুপুরের দিকে সামান্য আহার। সন্ধেতে বেশিরভাগ দিন আগুনের ধারে বসে সমবেতভাবে গীতাপাঠ। রাতের অন্ধকারে তারাভরা আকাশ দেখা। নদীর ধারে শ্মশানঘাটে আগুন জ্বলা দেখা। পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়া বাতাসের কানাকানি, নদীর স্রোত আর ঝিঁঝির ডাকের সিম্ফনি শোনা, মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টির রাতে গুহার কোণে কোনওরকমে পড়ে থেকে বৃষ্টির ছাঁট এড়ানোর চেষ্টা।

শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। মনে হয় সবসময় শুয়ে থাকি। মাঝে কয়েকদিন জ্বরও হল নদীর ঠান্ডা জলে চান করে। ডাক্তার দেখে কিছু কবিরাজী ওষুধ দিয়ে গেল। শুধু আমারই যে এরকম তা নয়, প্রত্যেকেরই এক অবস্থা। এত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা খুব কমেরই থাকে। তবে আশ্রমের গুরুভাইয়েরা এমনিতে খুব যত্ন নেয়। কারো শরীর খারাপ হলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে। বয়স্কদের উপর বিশেষভাবে খেয়াল রাখে।

ওখানে একটা জিনিস খুব অদ্ভুত লাগত। এত সুন্দর একটা জায়গায় শ্মশান রেখেছে কেন? ওটাকে আলাদা করে দিতে পারত, অবশ্য এটা ঠিক যে শ্মশানের এ আগুন দূর থেকে দেখে মন যেন কেমন উদাস হয়ে ওঠে। মনে হয় আমারও একদিন তো ওই দশা হতে চলেছে। এসব

কষ্ট তখন অনেক কম লাগে। প্রায় প্রতিরাতেই বৃষ্টি, আর সঙ্গে বজ্রপাত। আর সে বজ্রপাত এত অবিরাম হয় যে সকালে উঠে অবাক লাগে এই ভেবে যে এতগুলো গাছ রক্ষা পেল কীভাবে? দিন কুড়ির পর থেকে রোজ ডাক্তার এসে দেখত। ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জেকশানও দিত। ছাব্বিশ দিনের মাথায় শরীর এতই ভেঙে পড়ল যে ডাক্তার দুধ খেতে বলল। পরের দিন দুধ খাওয়ার পরই অদ্ভুত ব্যাপারটা হল।

দুধ খাওয়ার পরই মাথাটা কীরকম ঝিমঝিম করে উঠল। হঠাৎ করে মনে হল কে যেন আমাকে একটা অন্ধকার পথ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দুরন্ত গতিতে। আর সেই অন্ধকার চিরে হঠাৎ দেখতে পেলাম তীব্র আলো। বাবা মারা গেছেন দশ বছর হল। তাঁকে দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম আমার ছোটমাসিকে যে আমাকে ছোটবেলায় মানুষ করেছে। ছোটমাসিও বছর পাঁচেক হলো মারা গেছেন। স্কুল থেকে বেরোলেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকত এক অন্ধ ভিখারি, যাকে রোজ আমি টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে পাঁচ পয়সা দিতাম। তাকেও দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম প্রথম স্কুলে যাওয়ার দিন। স্পষ্ট। বাবার হাত ধরে স্কুলের চাতালে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হল আমি যেন আমার শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছি।

ওপর থেকে আমার শরীর দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম দূরে নদীর জল। চারদিকে পাহাড়। মনে হল আমার আর কোনও বন্ধন নেই। যেখানে চাই যেতে পারছি। সে এক অদ্ভুত স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা। মনে দুঃখের কোনও লেশ নেই, শুধুই স্বার্থহীন আনন্দ। কতক্ষণ এরকম ছিলাম জানি না। যখন জ্ঞান ফিরল দেখি আমাকে ঘিরে কয়েকজন গুরুভাই দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছিল। মনের মধ্যে কোনও পাপবোধ নেই, নিজেকে নিয়ে চিন্তা নেই ভাবনা নেই। বুঝলাম যে জন্য এখানে এসেছি, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয়েছে।

পরের দিন ভবানন্দজি আমাকে দীক্ষা দিলেন। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, আর কোনও প্রশ্ন নেই নিশ্চয়ই! এতদিনে নিজেকে ফিরে পেয়েছিস, যা এবার তা কাজে লাগা। এ সংসার শুধু মিথ্যেয় ভরা। কালকে যা অনুভব করেছিস তাই ঈশ্বর। ঈশ্বর তোর মধ্যেই আছেন,—বলে আমার বুকে হাত ছুঁইয়ে বললেন, 'এই এখানে।' এবার অন্যের কাজে নিজেকে

লাগা। অন্যের কষ্ট দূর করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা।' একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল, 'আমি এখন বুঝতে পারি কীভাবে আমি জীবনের এতগুলো বছর নষ্ট করেছি, যাই হোক গুরুর কৃপায় এখন আমার উপলব্ধি হয়েছে।'

'তা তুমি যে জায়গায় গিয়েছিলে সেটা কি শুধুই পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছিল? না আলাদা পাঁচিলও ছিল?'—এতক্ষণের নীরবতা ভেঙে অনিলিখাদি হঠাৎ একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসল। জানি না পাঁচিলের ব্যাপারটা এত দরকারি মনে হল কেন।

বিশ্বজিৎদা খানিকটা অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। পুরো জায়গাটা প্রায় তিরিশফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তা তুমি আন্দাজ করলে কী করে? আমারও একটু অবাক লেগেছিল। এমনিতেই অত বিচ্ছিন্ন জায়গায় অত উঁচু পাঁচিল কেন! তেমন দামি কিছুও তো নেই।'

'তোমাদের কি মারা হত?'—আবার অনিলিখা প্রশ্ন করল।

বিশ্বজিৎদা এবার সত্যিই অবাক। 'হ্যাঁ অনুমতি নিয়েই পিঠে দশবার করে রোজ বেত মারা হত। স্বামীজির মতে এটা আত্মশুদ্ধি, পুরোনো গ্লানির থেকে মুক্তির জন্য। যাতে মনে অতীতের কোন অপরাধবোধ না থাকে।'

'আচ্ছা, যেদিন সকালে তোমার এই দর্শন হল, তার আগের রাতেও কি বৃষ্টি-বজ্রপাত হয়েছিল?'

বিশ্বজিৎদা খানিক চিন্তা করে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, তার আগের দিন দুপুর থেকে প্রবল বৃষ্টি-বজ্রপাত হচ্ছিল। সেদিন সকাল অব্দি চলেছিল। আচ্ছা তুমি এসব প্রশ্ন করছ কেন বলত অনিলিখা?'

অনিলিখা মৃদু হেসে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, 'তোমার যেদিন ওই অনুভূতি হয়েছিল তা খুব একটা সাধারণ দিন নয়। ওই দিনের একটা বিশেষত্ব ছিল—কি জান?'

'আরে ওই দিনেই তো আমেরিকার ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটিতে পাগল একটা ছাত্র এলোপাথাড়ি গুলি করে অনেক ছাত্রছাত্রী মেরেছিল, তাই নয়?'—মিলন বলে ওঠে।

শিশির ধমক দিয়ে বলে ওঠে, 'থাম তো, তার জন্যে কি আর ওই দিনকে বিশেষ বলা যায়!'

অনিলিখার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি, 'ওটা ওই দিনের বিশেষত্বের একটা প্রকাশমাত্র। মহাকাশবিদ ছাড়া খুব কম লোকেই জানে যে ওই দিনটাতে চাঁদ গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব থেকে কাছে এসেছিল। অর্থাৎ—কী? বলতে পারিস?'

'ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কিছু ব্যাপার?'—রাতুল আমতা আমতা করে বলে ওঠে।

'ঠিক তাই। চাঁদের কাছে আসাটা পৃথিবীর তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর বিশাল প্রভাব ফেলে। আর তার প্রভাব পড়ে আমাদের মস্তিষ্কে।' অনিলিখা খানিক থেমে বলে ওঠে, 'আমি যা বলতে যাচ্ছি তা বলার সাহস খুব কম লোকেরই আছে। সারা বিশ্বে গুটি কয়েকজন বিজ্ঞানী আছেন যারা এটা জানেন।—তারাও এ ব্যাপারে কখনও প্রকাশ্যে কিছু বলবে না আর এ তথ্য গ্রহণ করতে হলেও মনটাকে খোলা রাখতে হবে।'

মাসিমা অধৈর্য হয়ে বলে ফেলেন, 'বলে ফেলো না অনিলিখা। এমন আর কী বলতে চলেছ? বিশ্বজিৎ তো আমাদেরই ঘরের ছেলে।'

'আমাদের মস্তিষ্কের সবথেকে বড় রহস্য হল টেম্পোরাল লোব। এটা মস্তিষ্কের দুই ধারে কানের পাশাপাশি থাকে। টেম্পোরাল লোব সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন আছে। তবে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই টেম্পোরাল লোবকে উদ্দীপ্ত করলে বিশ্বজিতের যা অনুভূতি হয়েছে ঠিক একইরকমের অনুভূতি হয়। লোকেরা হারিয়ে যাওয়া ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের দেখে, মনে হয় অনুভূতি শরীরের বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। শরীরকে ওপর থেকে দেখা যায়। অনুভব করা যায় একটা বৃহৎ শক্তিকে, এককথায় আমাদের চেতনাবোধ শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। অ্যালডাক্স হাক্সলে একেই বলেছিলেন মানুষ আর মহাবিশ্বের অচেনা এক বৃহৎ শক্তির মধ্যে সংযোগকারী মাধ্যম। তা কী করে এই টেম্পোরাল লোব উদ্দীপ্ত হয়? নাইট্রিক অক্সাইডের সাহায্যে। এই নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয় অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের মিশ্রণে বিদ্যুৎসংযোগে। অর্থাৎ নাইট্রিক অক্সাইড বাতাসে বেড়ে যায় বজ্রবিদ্যুৎপাত হলে। আর তাছাড়া উঁচু জায়গাতে এমনিতেই নাইট্রিক অক্সাইড বেশি থাকে।'

জয়দীপ বলে ওঠে, 'তুমি বলতে চাও বিদ্যুৎপাত হলে পরেই এ ধরনের অনুভূতি হয়। তাহলে তো লোকে আকছার এরকম দেখত।'

'না, শুধু নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হলেই যথেষ্ট নয়। নাইট্রিক অক্সাইড বাতাসের থেকে ভারী। দেখতে হবে এই নাইট্রিক অক্সাইড চারদিকে ছড়িয়ে না পড়ে। তাই চারধারে এই পাঁচিল। আর গুহার ভেতরে আরাধনা যাতে নাইট্রিক অক্সাইডের ঘনত্ব আরো বেশি হয়। এবার আসি শ্মশান প্রসঙ্গে। মৃতদেহ পোড়ালে বা পচলে তা থেকে মিথেন বলে একটা গ্যাস উৎপন্ন হয় যা মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে। বিজ্ঞান আজকে একথা বলছে, কিন্তু মুনি-ঋষিরা একথা অনেক আগেই জানতেন। তাই তাঁরা তপস্যা করতেন গুহায় বসে। শ্মশানের কাছে। আর শুধু যে আমাদের দেশেই এ অভ্যেস ছিল তাই নয়।

পিরামিড। পিরামিড তো মিশরীয়দের কাছে ছিল একধরনের উপাসনাস্থল। তাই পিরামিডের চারধারেও অতীতে ছিল উঁচু পাঁচিল যাতে নাইট্রিক অক্সাইড না বেরোতে পারে। কবরখানাও থাকত সব পিরামিডের খুব কাছে।' খানিক থেমে অনিলিখা আবার বলে ওঠে—

'আরেকটা জিনিস লক্ষ করবি, পৃথিবীর সব ধর্মস্থানই হয় নদীর ধারে যেখানে নদী হঠাৎ করে বাঁক নিয়েছে বা কোনও ঝরনার কাছে। কারণ ফ্রি ইলেকট্রন। টেম্পোরাল লোবকে উদ্দীপ্ত করতে আরেকটা অনুঘটক। বুদ্ধের নির্বাণ পাওয়ার কথাই ভাব। বুদ্ধগয়া নীরাঞ্জনা নদীর ধারে। বুদ্ধ এরপর প্রথম ভক্তদের উপদেশ দেন সারনাথে। সারনাথেও যে জায়গা বেছে নিয়েছিলেন তা ছিল নদীর ধারে। এবার, দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসি। উপবাস—নামমাত্র খাওয়া-দাওয়া আমরা অনেকে পুজোর দিনেই করি। হয়তো একদিন আধদিন। এ অভ্যেসটা এসেছে কোথা থেকে? আগে মুনি ঋষিরা দিনের পর দিন না খেয়ে সাধনা করতেন। বিশ্বজিৎ তো তাও কিছু একটা খেত। শরীরের উপর অত্যাচার, টেনশন, কষ্ট এ-ও এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে টেম্পোরাল লোব সহজে উদ্দীপ্ত হয়। কিছু ধর্মে তো বেত বা ছড়ি দিয়েও মারা হয়। এ সবই প্রস্তুতি। খুব সুস্থ শরীরে টেম্পোরাল লোব উদ্দীপ্ত হয় না।'

'তুমি এবার বলবে বিশ্বজিৎদাকে দুধ খাওয়ানো হয়েছিল—তাও বিশেষ উদ্দেশ্যে।' মিলন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল।

'দুধ তো অবশ্যই ইচ্ছে করে খাওয়ানো হয়েছিল। দুধে থাকে ট্রিপটোফ্যান। ট্রিপটোফ্যান অবসন্ন শরীরের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে খুব তাড়াতাড়ি প্রভাব বিস্তার করে। সেরোটনিন নামক এক রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে। ঠিক যেমন বুদ্ধকে করেছিল। উনপঞ্চাশ দিন উপবাসের পর বুদ্ধ যখন প্রায় মৃত, তখন সুজাতা নামক এক বালিকা বুদ্ধকে পায়েস দিয়েছিল। মনে পড়ে সেকথা? পায়েস মানেই দুধ। ট্রিপটোফ্যান যেভাবে বুদ্ধর ওপর প্রভাব ফেলেছিল, ঠিক তেমনই প্রভাব ফেলেছে বিশ্বজিতের ওপরে।

আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। অশোকের পরিবর্তনের কথাই ভাব। চন্ডাশোক থেকে ধর্মাশোক। কোথায় হয়েছিল কলিঙ্গ যুদ্ধ? দয়া নদীর ধারে, যেখানে নদী বাঁক নিয়েছে, ধৌলীগিরি পাহাড়ের উপত্যকায়। নাইট্রিক অক্সাইডের মতো ভারী গ্যাসের পছন্দের জায়গা। যুদ্ধে এক লক্ষের মতো সেনা মারা গিয়েছিল। সেদিনও হাজার হাজার চিতা জ্বলেছিল, তারপরে নেমেছিল বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টি। সবে মিলে আমরা পেলাম আমাদের সর্বকালের সেরা সম্রাটকে।'

তাহলে তুমি বলতে চাও বিশ্বজিৎদাও এখন বুদ্ধের মতো হয়ে গেছে?

এটাই তো মুশকিল। মহাপুরুষদের মধ্যে বাড়তি আরো কিছু থাকে। এত কিছু সত্ত্বেও যার নাগাল বিজ্ঞান এখনও পায়নি। আর যাই হোক, বিজ্ঞান কোনওদিন ল্যাবরেটরিতে মহাপুরুষ তৈরি করতে পারবে না। তবে এটাও ঠিক যে সব মহাপুরুষের জীবনেই বড় পরিবর্তন এনেছিল কোন একটা বিশেষ দিন। সেই দিন, সেই সময়, সেই পরিবেশ, সেই জায়গা ছিল একই রকম যার কথা তোরাও এখন জেনে গেলি। তবে দেখিস এসব কথা অপাত্রে বলিস না। মারধোর খেয়ে যেতে পারিস।



চেনা মুখ

তুই এখানে কী করছিস? বেড়াতে?

প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালাম। একমুখ দাড়ি, কাটাকাটা চোখ-নাক-মুখ। মেদহীন চেহারা। গায়ে হালকা নীল টি-শার্ট। কালো ট্র্যাক প্যান্ট। পায়ে স্পোর্টস শু। মুহূর্তে দাড়ির আড়ালে ঢাকা পড়া মুখটা চিনতে পারলাম।

—অর্ণব! তুই এখানে?

একগাল হেসে অর্ণব ওর টি-শার্টের উপর আঁকা লোগোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল—

—আগরওয়াল অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস-এ কাজ করছি। এই তাজপুরে আমরা বড় বড় কোম্পানির জন্য দু-একদিনের নানা গ্রুপ ইভেন্ট - মানে নানানরকম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস—লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি এসব অর্গানাইজ

করি। টিম স্পিরিট বাড়ানো—বুঝলি!

—বাহ্, বেশ মজায় আছিস তাহলে। অনেক দিন বাদে দেখা। বছর দুই আগে একবার বোধহয় দেখা হয়েছিল। তাই না!

—১৯ মার্চ, ২০১২—ঠিকভাবে বলতে গেলে। তুই গাড়িতে অফিসে যাচ্ছিলি। নীল শার্ট, সাদা-নীল ডোরাকাটা টাই ছিল। গাড়ির নাম্বার ছিল WBO2H1126, ঠিক তো?

আমি হেসে সায় দিলাম। গাড়ির নাম্বারটা অবশ্যই ঠিক বলেছে। সাদা-নীল ডোরাকাটা টাই আমার একটা আছে। সেদিন পরেছিলাম কিনা মনে নেই। দু'বছর আগের কথা। কিন্তু শুধু এটুকু জানি যে অর্ণব যা বলছে তার প্রত্যেকটা কথা সত্যি। ওর পক্ষে সবই সম্ভব।

অথচ দু-মিনিটের দেখা। আমি করুণাময়ীর মোড় পেরিয়ে গাড়ি চালিয়ে সেক্টর ফাইভ যাচ্ছি। সামনে পরপর গাড়ির লাইন। তাড়া ছিল। বাঁদিক দিয়ে বেরোতে গিয়ে একটা গাড়ির পিছনে আটকে আছি। হঠাৎ পিছনে ক্রমাগত হর্ণ। সাইড দিতে হবে। কোনওভাবেই সম্ভব নয়। হর্নের আওয়াজ অগ্রাহ্য করে সামনের গাড়িগুলো ছাড়ার জন্য অপেক্ষা করছি, হঠাৎ জানলায় টোকা। তাকিয়ে দেখি নামকরা এক ফার্নিচার কোম্পানির লোগো আঁকা জামা পরা একজন আমাকে ডান দিকে সরে গিয়ে জায়গা দিতে বলছে।

বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি লোকটার মুখে হাসি—ঋজু না?

একটু সময় লাগলেও, চিনতে পেরেছিলাম। অর্ণব। স্কুল ছাড়ার কুড়ি বছর পরে দেখা। মাঝে একবারও যোগাযোগ হয়নি। অথচ অর্ণব আমার মোটামুটি ভালোই বন্ধু ছিল।

এরমধ্যে গাড়িগুলো ছাড়ছিল। আমার গাড়ি স্টার্ট করার আগে অর্ণব আমার ফোন নাম্বারটা চেয়েছিল। আমি দিয়েছিলাম। বলেছিল ফোন করবে। কিন্তু করেনি। অন্য কেউ হলে ভাবতাম নাম্বারটা ভুলে গেছে। ওরকম পরিস্থিতির মধ্যে একবার শুনে কে-ই বা ফোন নাম্বার মনে রাখতে পারে। কিন্তু অর্ণব বলেই সেই সংশয় ছিল না। ও নিশ্চয়ই ভোলেনি। আমার

দিক দিয়ে যোগাযোগ করার কোনও উপায়ই ছিল না।

—তা তোর সেই একই ফোন নাম্বার আছে? ৯৪৩৩০ ২৯২২৮!

ওর প্রশ্নে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। রাগ করেই বললাম—তোকে দিয়ে কোনও লাভ আছে? এতদিনে একবারও তো ফোন করলি না।

অর্ণব জোরে হেসে উঠে জড়িয়ে ধরল।

—সরি স্যার। কান মুলছি।

তারপর আর সত্যিই রাগ রাখা যায় না।

—তা সেই ফার্নিচার কোম্পানির চাকরিটা ছাড়লি কবে?

—বছরখানেক। একঘেয়ে লাগছিল। তা ছাড়া একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঢাকুরিয়ায় এক বাড়িতে ফার্ণিচার ডেলিভারি করতে গিয়েছিলাম। সেখানে বাড়ির মালিকের সঙ্গে আমার মারামারি হয়।

—সেকী? কেন?

লোকটার মুখটা দেখেই আমার মনে পড়ে গেল বছর দুয়েক আগে এর ছবিই বেরিয়েছিল খবরের কাগজে। একজন বয়স্ক লোককে ধাক্কা মেরে অটো থেকে ফেলে দিয়েছিল। তা এরপরে কি আর চাকরি থাকে! মাঝে কয়েকমাস বসেছিলাম। তারপর এখানে। এখানে আমি সমুদ্রে কায়াকিং, প্যারাসেলিং, নানান ধরনের অ্যাক্টিভিটি স্পোর্টস এসব করাই। ভালোই সময় কেটে যায়। মেজাজটাও এসবের মধ্যে বেশ চনমনে থাকে। তা তুই নিশ্চয়ই এখানে ওসব করতে আসিসনি।

—না, না, পাগল! দিব্যি আছি। এই বয়সে অত লাফালাফি করার কী দরকার? দুদিনের জন্য ফ্যামিলি নিয়ে এসেছি। এই পাশের একটা রিসর্টে আছি। শুয়ে বসে দুদিন কাটিয়ে ফিরে যাব।

—তুই তো এখন নিশ্চয়ই কোম্পানির বড় সাহেব?

—ওই আর কি! তবে সিঁড়ির শেষ মাথায় যখন কেউ দাঁড়ায় জায়গাটা খুব নড়বড়ে হয়, তাই না? আমারও তাই। প্রচুর টেনশন। এসব ট্রিপ একটু নিঃশ্বাস নেবার জন্য। বুঝলি?

আরো মিনিট কুড়ি গল্প হল অর্ণবের সঙ্গে। সমুদ্রের ধারে ডাব কিনে খেলাম। একসঙ্গে সমুদ্রের ঢেউয়ে পা ভেজালাম। এরমধ্যে ওর কোম্পানির

একজন লোক এল। ও তার সঙ্গে চলে গেল। আমিও বীচের ধারে খানিকক্ষণ হেঁটে হোটেলে ফিরে এলাম।

আমি আর অর্ণব একইসঙ্গে বারো বছর স্কুলে পড়েছি। আমি ছিলাম বরাবরই ক্লাসের প্রথম দিকের ছাত্র। আর ও ছিল সবেতেই একদম মাঝারি মানের। তবে তার জন্য বন্ধুত্বে কিছু ভাঁটা পড়েনি।

অর্ণবের এক অস্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। একটু অন্যধরণের দৃষ্টিশক্তি আর অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি। অন্যধরণ, অস্বাভাবিক—এই কথাগুলো বলছি খানিকটা ইচ্ছে করেই। নিউটনের তিনটে সূত্র মুখস্থ রাখতে ও হিমশিম খেত। কবিতা মুখস্থ বলতে গিয়ে দু-তিন লাইন পরেই থেমে যেত। অথচ কে কোনদিন কী রঙের জামা পরে এসেছে, কে কবে ক'টায় ক্লাসে এসেছে —এসব ওর ঠোঁটস্থ থাকত। কীভাবে মনে রাখত তা ও-ই জানে!

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় একটা অপারেশানের জন্য আমি এক সরকারি হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলাম। দিন দশেক ছিলাম। আমাকে দেখতে অর্ণব এসেছিল একদিন। একঘণ্টা ছিল। তার প্রায় তিনবছর পরের কথা। হঠাৎ হাওড়া স্টেশনে ভীড়ের মধ্যে এক মহিলাকে দেখিয়ে ও বলল—'চিনতে পারলি?'

পরে জানলাম অর্ণব যেদিন হাসপাতালে এসেছিল সেদিন ওই মহিলাকে দেখেছিল। উনি নার্স ছিলেন। জিগ্যেস করে পরিচয়ও সেরকমই পেলাম।

তা, এই হল অর্ণব। যেটা মনে রাখার নয়, সেটা মনে রাখত আর যা মনে রাখার তা বেমালুম ভুলে যেত। ওর সব মনে রাখা যেন প্রয়োজনের বাইরে।

ব্যাপারটা নিয়ে আমরা মজা করতাম। একদিন কথায় কথায় ও বলেছিল,—জানিস ঋজু, আমি যাকে দেখতে পাই তার প্রত্যেকটা কথা মনে রাখতে পারি। ধর তোকে দেখলাম—তখন তোর সব ডিটেলস, সব কথা - সব কিছু মনে থেকে যায়। কী করে জানি না। আর যাকে দেখতে পাই না—যেমন ধর নিউটন—তার কথাও মনে থাকে না।

বোঝো! তা, এরপর আমি নিউটনের একটা ছবি ওকে দিয়েছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার। তারপরে আর ওর ওই সূত্রগুলো নিয়ে সত্যিই ভুল হয়নি।

তা এই হল অর্ণব। বিচিত্র মেমারি।

বিকেলের দিকে রিসর্ট থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার ওর দেখা পেলাম। তবে এবার গল্প করার মতো অবস্থায় ও ছিল না। ও আর ওর সঙ্গে একইরকম পোষাক পরা দুজন লোক জনাতিরিশেকের একটা বড় গ্রুপকে নিয়ে নানান ধরণের কসরৎ করছিল, যাকে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ও বলা যায়। মাটির থেকে চারফুট উপরে দুই গাছের মধ্যে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা গুঁড়ির উপর দিয়ে ব্যালেন্স রেখে সারি বেঁধে হাঁটা, দড়ি বেয়ে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া—এরকম নানা ধরনের টিম গেম। তাছাড়াও আছে বিভিন্ন ধরনের রেস। কোনওটা দল বেঁধে, কোনওটা আলাদা করে।

বেশ খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। দলটার মধ্যে বেশিরভাগের বয়সই তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। কয়েকজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে হঠাৎ করে একদিন এ ধরণের অ্যাডভেঞ্চারে নেমে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে।

খানিকবাদে দলটাকে নিয়ে অর্ণবের এক সহকর্মী সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল। কায়াকিং অর্থাৎ রাবারের নৌকোতে করে সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে যাবে। বুঝলাম অর্ণবের দায়িত্ব শেষ।

ও দেখি একটা উঁচু গাছের নীচে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু খেয়ালই করল না, অন্যমনস্ক হয়ে কীসব ভাবছে। 'অর্ণব' বলে ডাকতে চমকে আমার দিকে ঘুরে তাকাল।

—কি এখানেও কিছু ইভেন্ট হবে না কি?

—আজকে না, কালকে। আমার উপর সব ব্যবস্থা করার দায়িত্ব—বুঝলি?

—কীরকম?

—ওই, ওই ওপরের ডালটা দেখছিস—ওই যে ওপরের সবথেকে মোটা ডালটা—ওখান থেকে ওরা লাফ দেবে, এক এক করে।

—অ্যাঁ, ওখান থেকে লাফ দেবে? বলিস কী রে। পড়লে তো হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে যাবে। কতটা উঁচু হবে? সাত-আট তলা বাড়ির হাইট

তো হবেই, তাই না?

—হ্যাঁ, তা তো হবেই। তা ওরা কি আর এমনি এমনি লাফ দেবে! পিঠে আর কোমরে দড়ি বাঁধা থাকবে। মাটির থেকে তিনফুট ওপরে এসে থামবে। তবে শুধু তাই নয়। এখানেই রোমাঞ্চের শেষ নয়। পাশের ওই যে গাছ দুটো দেখছিস—তার মধ্যে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা হাঁড়ি ঝোলানো থাকবে। মাটিতে লাফিয়ে পড়ার আগে ওই হাঁড়িটা ছুঁয়ে আসতে হবে। ডাল থেকে এমনভাবে লাফ দিতে হবে যাতে ওই হাঁড়িটা ছোঁয়া যায়।

—বাপ্‌স রে! রীতিমতো রোমহর্ষক। এই বয়সে? হার্টফেল করবে তো লোকজন।

—না, না সেরকম কোন রিস্ক নেই। সেজন্যই তো আমরা আছি। সবার মেডিক্যাল টেস্ট-ও করা হয়েছে।

—তা হবে কখন ইভেন্টটা?

—এই ধর, একটা নাগাদ।

—আমার কাল দিঘা যাবার প্ল্যান ছিল। যাব না। এখানেই আসব তা হলে।

—ধুর—তুই আসবি কী জন্যে? একটার জায়গায় তিনটেও বাজতে পারে। কোনও ঠিক আছে? আর তাছাড়া, ব্যাপারটা এমন কিছু নয়।

বুঝলাম না কেন অর্ণব আমার উপস্থিতির ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা উৎসাহ দেখাল না। হতে পারে যে আমি থাকলে ও হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে। কাজে অসুবিধে হবে। তাই এই নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না।

—তা, এবারকার গ্রুপটা কেমন?

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল আবার ও। বলল—

—ভালো মন্দ মিশিয়ে। কিছু লোক ভালো—কিছু খারাপ—যেমন হয় আর কি। চল, একটু হাঁটা যাক্ বালির ওপর দিয়ে। এখান থেকে শঙ্করপুর বীচের ধার দিয়ে হাঁটতে দারুণ লাগে। ছয় কি সাত মাইল। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা কথা বলতে লাগলাম। সমুদ্র আর ধারের শালবনের মধ্যে দিয়ে ভারী মনোরম বালির উপরে হাঁটার পথ। কোথাও

উঁচু, কোথাও নীচু। নানান জায়গায় কচ্ছপের খোলস, ছোট-বড় নানান মাছের কঙ্কাল পড়ে আছে। আর আছে ছোট ছোট কাঁকড়ার দল। একটা বড় জেলিফিস মরে পড়েছিল। অর্ণব হঠাৎ তার পাশে বসে পড়ল। বসে ওটাকে হাত দিয়ে ধরে দেখতে দেখতে বলে উঠল—আমার মুশকিল কি জানিস—অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। মনে না পড়লেই হয়তো ভালো ছিল।

—মানে?

—মনে আছে 'সুজন' কাণ্ডের কথা? অনেক বছর আগের কথা অবশ্য। আমরা তখন স্কুলে পড়ি। সহজ কিস্তিতে একটু একটু করে টাকা দিয়ে জমি কেনার একটা প্রকল্প এনেছিল ওরা। জমির বদলে টাকাও পাওয়া যাবে। অনেকের মতো আমার বাবাও পাঁচ বছর ওখানে টাকা দিয়েছিল। যদিও নিম্নবিত্ত লোকেদের অত উচ্চাকাঙক্ষা থাকতে নেই, কিন্তু আমার বাবার অত বুদ্ধি ছিল না। সহজ সরল লোক। চোখ বুজে অতগুলো বছর টাকা দিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল জমিটা পরে বিক্রি করে আমার পড়াশোনার খরচের ব্যবস্থা করবে, দিদির বিয়ের ব্যবস্থা করবে। তা সে আর হল না। দেখা গেল পুরোটাই ফ্রড। ভোঁ-ভোঁ। কিছু নেই। আমি তো আর তোর মতো ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না যে সবেতেই সরকারি স্কলারশিপ পাবো। টাকা থাকলে যা একটু ভালো কলেজে পড়ার সুযোগ পেতাম—তাও হল না।

আমিও ওর ব্যথাটা অনুভব করলাম। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি, খেলেছি। আজ আমি কোথায় আর ও কোথায়! কিন্তু হঠাৎ করে এতদিন পরে ও আজ একথাটা কেন বলছে বুঝতে পারলাম না। আমার সঙ্গে দেখা হবার জন্যই কি এসব কথা ওর ফের মনে পড়ে যাচ্ছে! সাফল্যের একদিক—ব্যর্থতার অন্যদিক। হঠাৎ প্যান্টটা ঝেড়ে অর্ণব উঠে দাঁড়াল। বীচের ধারে পড়ে থাকা একটা নুড়ি তুলে জোরে ছুড়ে দিল সমুদ্রে। তারপর আরেকটা। কেমন যেন অজানা আক্রোশে পর পর বেশ কয়েকটা নুড়ি ছুড়ে ফেলল সমুদ্রের জলে।

তারপর উদাস চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—

—সবকিছু ওই ঢেউ-এর মতো ফিরে আসে না। আমি যখন হায়ার সেকেন্ডারি পড়ছি, এই কেলেঙ্কারীটা ধরা পড়ে। সেই শকে বাবা সেই যে শয্যাশায়ী হলেন, আর সুস্থ হননি।

ঢেউ-এর শব্দে ওর দীর্ঘশ্বাসটা হারিয়ে গেল। চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও।

—তা 'সুজন' ফান্ডের কেলেঙ্কারীতে যারা যুক্ত ছিল তাদের কী হল?

—কী আবার হবে? পাবলিকের শর্ট মেমারি। আমার মতো যারা বাপ হারিয়েছে তারা বাদে সবাই ভুলে গেল। ওর পিছনে যে লোকটা আসলে ছিল সেই পরাশর মাইতি হাসতে হাসতে জেল থেকে বেরিয়ে এল দুবছর বাদে। ব্যস—খেল খতম!

—তা সে লোকটা এখন আছে কোথায়?

এতক্ষণে মুচকি হাসল অর্ণব। তারপর একটা হাত তুলে মাথার উপরে প্লেনের মতো গতি দেখিয়ে বলল—বিদেশে। তার আর কোনও পাত্তা নেই। কেস ক্লোজড। আমার কিন্তু ওই লোকটার মুখটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল সব ছবি। ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ এখনও খুব স্পষ্ট। স্পষ্ট মনে আছে। শেষ কথাগুলো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ঘরে-ফেরা পাখিদের ডাকে বুঝতে পারলাম যে সন্ধ্যে হতে আর বেশি দেরি নেই। সমুদ্রের ধার ধরে প্রায় মাইল পাঁচেক হেঁটে ফেলেছিলাম। শঙ্করপুরের দিকে। এবার ফেরার পথ ধরলাম। ফেরার সময় আমাদের মুখে আর কথা ছিল না। শুধু সমুদ্রই ঢেউ-এর শব্দে কথা বলে যাচ্ছিল। আর সূর্য ডোবার তুলি রঙের খেলায় আকাশটা একাই মেতে উঠেছিল।

পরের দিন ভোর ভোর গাড়ি নিয়ে দিঘার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ফিরতে ফিরতে বিকেল পাঁচটা। গাড়ি যখন তাজপুরের রিসর্টের কাছে, তখন হঠাৎ দূর থেকে রাস্তায় একটা বড় জটলা চোখে পড়ল। ওখানেই দুদিন অর্ণবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ড্রাইভারকে থামতে বলে নেমে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখি একটা পুলিশের গাড়ি। একটু দূরে একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে।

একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস চলার সময় একটা

লোক দড়ি খুলে গাছের ডাল থেকে মাটিতে এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। হাসপাতালে যদিও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগরওয়াল স্পোর্টসের ম্যানেজার অর্ণব সান্যালই নাকি এর জন্য দায়ী। সবধরণের সাবধানতা নেওয়া হলে কখনওই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না।

খানিক বাদে অর্ণবকে দেখলাম পুলিশের সঙ্গে পুলিশের ভ্যানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এইটুকুই যা কথা বলার সুযোগ। হাত তুলে নাড়লাম। ও দাঁড়িয়ে পড়তে কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম—

—কী করে এটা হল অর্ণব? তোরা তো এরকম ইভেন্ট নিয়মিত করছিস।

—অ্যাক্সিডেন্ট কি আর বলে কয়ে হয়?—কথাটা জোরে বলে আমার দিকে আরো এক পা এগিয়ে এসে খুব মৃদু স্বরে বলে উঠল—

—শুধু কাগজে দেখা চেনা মুখ চোখে পড়ে গেলে দড়ি বাঁধাটা অনেক সময় টাইট হয় না। কালকেই চিনতে পেরেছিলাম। আসি রে! তোকে বলেছিলাম না! মেমারি মোটেই ভালো জিনিস না।



দেওয়ালের রং ছিল সাদা

১

মাঝে বহু বছর কেটে গেছে। ও টেরও পায়নি। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে প্রথমেই ফেলে আসা এতগুলো বছরের পরিবর্তন খুঁজে বার করার চেষ্টা করল সাত্বিক। এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে এসে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

চারদিকে ছুটোছুটি—ব্যস্ততা। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই লোকে ছুটে চলেছে এয়ারপোর্ট কানেক্টিং ট্রেনের খোঁজে, ট্যাক্সির খোঁজে। লক্ষ করছে না বাইরের সাদা মেঘ ছড়ানো নীল আকাশকে। লক্ষ করছে না কিছু দূরে বসা একঝাঁক পায়রাকে। জানে না একটা মুহূর্ত হঠাৎ সব কিছু পালটে

দিতে পারে। সব পরিচয় মুছে দিতে পারে। অকারণ হয়ে যেতে পারে সব ব্যস্ততা।

এ শহর যত খারাপই হোক না কেন, এ শহর ওর আপনার শহর। এখানকার বাতাস ওর বড় প্রিয়। এখানের বাতাসে মিশে আছে ওর প্রিয়জনের ডাক। আনন্দে উত্তেজনায় ওর মনে হল চিৎকার করে বলে ওঠে,—আমি এসে গেছি। তোমাদের সব অপেক্ষা শেষ।

ট্রলিব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে ও এগিয়ে গেল সামনের ট্যাক্সিটার দিকে।

—লেক গার্ডেনস।

—১০০ টাকা বেশি লাগবে। ফেরার সময় প্যাসেঞ্জার পাব না।

হেসে উঠল সাত্ত্বিক। অনেক কিছু পালটায়নি। রাস্তায় বেশ কিছু দামি বিদেশি ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে। রাস্তা একটু ভালো হয়েছে। এয়ারপোর্টের সামনের বেশ কিছু জায়গায় চলন্ত রাস্তা হয়েছে। কিন্তু লোকের অভ্যেস কি আর অত সহজে পালটায়!

গাড়িতে উঠে জানলা নামিয়ে বাইরে বাতাসের স্পর্শ পেতে চাইল সাত্ত্বিক।

সামনে থেকে ড্রাইভার বলে উঠল—সর্বনাশ! করছেনটা কী! আজকের খবরে দেখেছেন! এ হাওয়াতে সাংঘাতিক বিষ মিশে আছে। বেশি নিশ্বাস নিলেই, ফুড়ুৎ। প্রতি মিনিটে জীবন থেকে পাঁচ মিনিট মাইনাস। চারদিকে ক্যান্সার কীরকম বেড়েছে দেখেছেন!

ওর অবশ্য বিষাক্ত হাওয়ায় কিছু আসে যায় না। তবু জানলা তুলে দিল সাত্ত্বিক। কাচের বাইরের শহরটার সঙ্গে একটু দূরত্ব রাখাই বোধহয় ভালো। অনেকেই মাথায় হেলমেটের মতো কিছু একটা পরে রেখেছে। নাক-মুখ ঢাকা কাচের আবরণে।

ওর কৌতূহলী দৃষ্টি লক্ষ করেই লোকটা বলে উঠল—অনেক দাম বুঝলেন, আমাকেও টাকা জমিয়ে কিনতে হবে একটা। ওর মধ্যে অক্সিজেন আছে। তা আপনি আসছেন কোথা থেকে? ওখানে এরকম নেই?

—নিউইয়র্ক। হয়তো ওখানেও আছে। খেয়াল করিনি।

লোকটা একটু অবাক হল উত্তরটা শুনে।—সে কী, খেয়াল করেননি!

কেন, রাস্তায় বেশি বেরোন না বুঝি?

সাত্ত্বিককে চুপ থাকতে দেখে লোকটা ফের বলে উঠল—অবশ্য হবেই বা কী করে! লোকে তো শুনেছি ওদেশে গাড়ি ছাড়া রাস্তাতে বেরোয়ই না। তাই না!

লোকটা মাথা ঘুরিয়ে পিছনে সাত্ত্বিকের দিকে তাকাল। মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল সাত্ত্বিক।

গাড়িতে জিপিএস বসানো। গাড়ি নিজের মতো এগিয়ে চলেছে। লোকটা শুধু স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বসে আছে।

লোকটার ড্রাইভার হিসেবে কী কাজ বুঝতে না পেরে সাত্ত্বিক প্রশ্ন করে উঠল—আচ্ছা গাড়ি চালাতে আপনাকে তো কিছুই করতে হয় না। তা হলে আপনার কাজটা কী?

মুচকি হেসে লোকটা বলে উঠল—প্রশ্নটা হল, গাড়িটা কার? না বসে থাকলে 'আমার গাড়ি'র জায়গায়, 'গাড়ির আমি' হয়ে যাব না তো? যা শুনছি চারদিকে! আমাদের সব চাকরি যেতে বসেছে রোবটগুলোর হাতে। এয়ারপোর্টের বাইরেও যত সিকিউরিটি দেখলেন, সবই রোবট। বোঝেননি তো! আমিও প্রথমে বুঝতাম না। একদম মানুষের মতো চেহারা, একটু ভালো দেখতে এই আর কী! আর সাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা ওভাবে কাজ করে যায়। ভাবুন তো!

—একটু থেমে গর্বের হাসি হেসে লোকটা ফের বলে উঠল—আপনার কী মনে হয়? মানুষের যুগ শেষ? এবার রোবটদের যুগ? ওরা তো প্রায় সবদিক দিয়েই আমাদের আগে। কী খাটতে পারে ভাবা যায়! আর কোনও ভুলচুক নেই। তবে আমাদের সঙ্গে তর্কে ওরা পেরে উঠবে না। আমার গিন্নির সঙ্গে তো নয়ই।—নিজের মনেই হেসে উঠল লোকটা।

চুপ করে রইল সাত্ত্বিক। অনেক পুরোনো স্মৃতি ভিড় করছিল।

উত্তর না পেয়ে একটু যেন ক্ষুণ্ণ হল লোকটা। ফের বলে উঠল—আসলে আজকাল কথা বলার লোকই তো পাওয়া যায় না। সবাই হয় বিষাক্ত বাতাসের ভয়ে নাক-মুখ ঢেকে বসে আছে, না হলে ফোনে কথা বলে যাচ্ছে। সামনে কে আছে তাকেই খেয়াল করছে না। সামনের লোকই

সব থেকে দূরে। তাই না!

হু—বলে একটা অস্ফুট আওয়াজ করল সাত্ত্বিক।—হ্যাঁ, তা ঠিক। আমি আসলে বহু বছর বাদে কলকাতায় এলাম তো। তাই অবাক হয়ে আমার পুরোনো শহর দেখছি।

—কত বছর বাদে?

—পঁচিশ বছর।

—বলেন কী? সে তো বহু দিন। আপনার কেউ নেই বুঝি এখানে!—একটু থেমে লোকটা আবার বলে উঠল—অবশ্য আসবেনই বা কেন? কী আছে এ শহরে? ওই ঐতিহাসিকরা আসতে পারে, অনেক বছর আগে কীরকম জীবন ছিল তা জানতে। কারণ এখানে তো আর কোনও উন্নতি হয়নি, অথচ সারা পৃথিবী এগিয়ে গেছে। অথবা যারা জল নিয়ে গবেষণা করে, তারা আসতে পারে।

—কেন? জল নিয়ে গবেষণা করতে এখানে আসবে কেন?

—আরে মশাই, তাও জানেন না! শহরটা ডুবতে বসেছে, সে খবর রাখেন তো? শহরের ধার দিয়ে পাঁচিল করার কথা হচ্ছে। যাতে জল না ঢোকে। পুরো সুন্দরবন তো জলের তলায় চলে গেছে। এখন কলকাতা নিয়ে চিন্তা।

—সে কী!

—সমুদ্র দিন কে দিন উপরে উঠে আসছে। ওই কি গ্লোবাল ওয়ারমিং না কী বলে না! বলা হচ্ছে পুরো শহর নাকি জলের তলায় চলে যাবে। পরের বার এলে দেখবেন নৌকায় করে এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি যাচ্ছেন। হাসছেন? মনে রাখবেন শঙ্করের কথা খুব একটা ভুল হয় না। আমি তো আরেকটু টাকা জমলেই কলকাতা ছেড়ে বাইরে চলে যাব। কে বলতে পারে ঘুম থেকে উঠলাম, দেখলাম খাট জলে ভাসছে।

লোকটার কথা শুনতে শুনতে সাত্ত্বিক বাইরের দিকে দেখছিল।

একটা জিনিস সত্যি কমেনি। তা হল ট্রাফিক জ্যাম। সামনে বিশাল গাড়ির লাইন।

—আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে খেয়াল হয়নি। এই সময়ে

বাইপাসের উপরে জল রেশনের লাইন পড়ে।

—জল রেশন! তার মানে?

—আপনি কি মঙ্গল থেকে আসছেন মশাই! কিছুই খবর রাখেন না! পানীয় জলের কথা বলছি—কে কতটা পাবে, তার তো কোটা ঠিক করা থাকে জানেন নিশ্চয়ই। তা সেই অনুযায়ী এখান থেকে জল নিয়ে যেতে হয়। মাসের মধ্যে কয়েক দিন হয়। আজকের কথা খেয়াল ছিল না। আমার গিন্নি ওদিকটা সামলায়। অনেক ঝামেলা বুঝলেন। সারা মাস তার পরে মেপে মেপে জল খেতে হয়। তবু আমার কিছু চেনা লোক ছিল বলে, কিছুটা বেশি পাই।

—পানীয় জল! তা দাম কত পড়ে?

—এ কি সোনা-হিরে পেয়েছেন, যে টাকা ফেলবেন আর যা চাইবেন পেয়ে যাবেন! টাকা দিয়ে কি আর জল পাওয়া যায়! তা হলে তো আমার মতো লোকের জলই জুটত না। তাই না! ভাগ্য ভালো, সরকার জল নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে আমজনতার জন্যে জল বণ্টন করে, যাতে কেউ বেশি জলের ভাগ না কিনে নিতে পারে। বুঝলেন?

তেমন সাড়া না পেয়েও কথা বলতেই থাকে লোকটা।

সাত্ত্বিকের সেদিকে মন নেই। ওর শুধু মনে পড়ছিল ওর ছোটবেলার কথা। মা-র কথা। সাদা দেওয়ালটার কথা। যে দেওয়ালটা ও রং পেন্সিলের দাগে ভরিয়ে দিয়েছিল। ছাদের পায়রাগুলোকে খেতে দেওয়ার কথা। বাবার কাছে গল্প শোনার কথা। স্কুলের বন্ধুদের কথা। ফুটবল খেলতে গিয়ে পা ভাঙার কথা। জ্বর হলে মা-র সারারাত ধরে কপালে জলপটি দেওয়ার কথা।

এ সব যেন ঠিক কালকের ঘটনা।

তারপরই মনে পড়ল সেদিনকার কথা। হঠাৎ করে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যেন সারা বাড়িটা দুলে উঠল। ওকে সেদিন যেতে হয়েছিল ওই বাড়ির আশি তলায়। ওর মনে হল যেন হঠাৎ করে ৮০ তলার সব জানলা কেউ খুলে দিয়েছে। ভেতরের আলো সব নিভে গেল। গরম হাওয়া, ধুলো আর ইটের টুকরো এসে ঝাপটা মারল সারা শরীরে। দম বন্ধ হওয়া

পোড়া ধোঁয়া। আর মনে পড়ল না কিছু।

লোকটা রাস্তা ভালোই চেনে। বড় রাস্তা ছেড়ে শহরের অলি-গলি ধরে এগিয়ে চলেছে।

খানিকবাদে অধৈর্য হয়ে সাত্ত্বিক বলে উঠল—আর কতক্ষণ লাগবে?

এই তো প্রায় এসে গেছি—বড় জোর আর আধঘণ্টা। কলকাতার রাস্তায় সময় বলা আর মেয়েদের মন বোঝা একই রকম শক্ত!—বলে একটু খুকখুক করে হেসে ফের বলে উঠল,—তা দাদা শুনেছি আমেরিকার রোবটগুলো নাকি আরও বুদ্ধিমান, শুধু মানুষের মতো দেখতেই নয়, মানুষের মতো বুদ্ধিও ধরে। তাই নাকি! এখানকার গুলো ভারী বোকা। যেটুকু বলা হবে—ব্যস সেটুকুই। সেদিন দেখি এয়ারপোর্টের গেটের একটা সিকিউরিটির রোবট এয়ারপোর্টেরই এক বড় অফিসারকে আটকে দিয়েছে, আইডি নেই বলে। কিছুতেই ঢুকতে দিল না। অথচ ওই অফিসার রোজ দশবার করে ঢোকে-বেরোয়। শুধু সেদিন আইডি ফেলে এসেছে ভুল করে। ঢুকতেই দিল না শেষমেশ। বলুন তো কী বুদ্ধি!

লোকটা কথা বলেই চলল। সাত্ত্বিক অবশ্য আর শুনছিল না। ওর মনে হচ্ছিল ও হঠাৎ করে ফিরে গেছে ছোটবেলার কোনও একদিনে। জানলার বাইরের শহর এত বছরের না বলা কথা একসঙ্গে বলতে চাইছে।

২

—এবার খেতে চলে এসো। আর কতক্ষণ বসে থাকবে!

—আসছি। ওর সঙ্গে আরেকটু কথা বলে নিই। আজ ওর জন্মদিন। ভুলে গেছ!

—সে তো তুমি গত দু-ঘণ্টা ধরে এক কথা বলছ। আর কত কথা বলবে!

—দেখছ না। বাবু কী অত তাড়াতাড়ি ছাড়ে!

মানিকবাবুর রোজই এই এক অভিজ্ঞতা। বহু বছর হয়ে গেছে। একমাত্র

ছেলে আমেরিকায় পড়তে গিয়ে ২০০১-এ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে টুইন টাওয়ারে টেররিস্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। কিন্তু ওনার স্ত্রী মিনু এখনও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। আজও তাই। আজ আবার ওর জন্মদিন। সকাল থেকে মানিকবাবুর মন তাই এমনিতেই খারাপ।

ওনার স্ত্রী কথা বলে চলেছে। খানিক দূরে ওনার ছেলের ত্রিমাত্রিক ছবি দেখা যাচ্ছে। ওদিক থেকে রোজকার মতো শোনা যাচ্ছে ছেলের গলা—

—তা মা, তোমার শরীর ভালো আছে তো?

—আর ক'বার জিগ্যেস করবি! বয়সের সঙ্গে শরীর তো একটু খারাপ হবেই। পায়ের ব্যথাটা একটু বেড়েছে এই আর কী! তা তুই এবার এদেশে চলে আয়। আর কত দিন ওদেশে থাকবি!

—আসব মা, রিসার্চটা প্রায় শেষের দিকে।

—আর কত দিন ওই এক কথা বলবি। বাবারও বয়স হয়েছে। এ বয়সে বাইরের সব ঝুট ঝামেলা মেটানো কি সহজ! সেদিন রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। তুই এলে একটা ভরসা হয়।

কথা চলতেই থাকে।

আরও আধঘণ্টা বাদে ধৈর্য হারালেন মানিকবাবু।

সামনে ছেলের হলোগ্রামটার দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন মানিকবাবু—আর কতদিন বলব—ও নেই। ও আমাদের ছেড়ে বহু বছর আগে চলে গেছে।

—কী আবোল তাবোল বলছ। বাবু তো সামনেই বসে আছে। কখন থেকে আমার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে আমেরিকা থেকে। শুনতে পাচ্ছ না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার কানটাও গেছে।—বলে থেমে আবার ছেলের দিকে মুখ করে বলে উঠলেন,—বাবু এবার তুই এখানে এলে তোর বাবার কানটা ডাক্তারকে ভালো করে দেখাস। তা আজকে কী খাবি? হাবিজাবি কিছু খাস না। বড় রোগা হয়ে গেছিস।

—তুমি পাগল হয়ে গেছ।—বলে সামনের তাকে রাখা একটা পুরোনো লালচে খবরের কাগজ নিয়ে সামনে ছুড়ে দিয়ে বলে উঠলেন মানিকবাবু।

—এই যে পড়ো হেডলাইন নিউজ। নিউইয়র্ক টাইম্‌সের ২০০১-এর ১২ সেপ্টেম্বরের কাগজটা দেখিয়ে উনি ফের বলে উঠলেন,—U.S. Attacked, Hijacked Jets destroy twin towers.—দেখতে পাচ্ছ। আমাদের বাবুও ঠিক সেই সময়ে ওই বিল্ডিং-এ ছিল। তার দুদিন বাদে ওর একেবারে ভারতে ফিরে আসার কথা ছিল। আমাদের কাছে। কই—তা হল কই! তা হল কই! ও আর কোনও দিন আসবে না। কতদিন আর এক কথা বলব!

—কী যা তা বলছ। ওর সঙ্গে তো আমার রোজ কথা হয়। ওই দেখো না আমার সঙ্গে কথা বলছে।

—পুরো ব্যাপারটা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। ভারচুয়াল রিয়ালিটি। ওর ত্রিমাত্রিক ছবি প্রোজেক্ট করা হচ্ছে। ওকে দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধির মাধ্যমে কথা বলানো হচ্ছে, যাতে তোমার প্রশ্নের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে উত্তর দেয়। কেন তুমি বোঝো না ও রোজ তোমাকে সাজানো গোছানো কিছু কথা শোনায়।

একটু থেমে মানিকবাবু ফের বলে উঠলেন,—কয়েক বছর আগে তোমার জন্য এই যন্ত্রটা অনেক দাম দিয়ে কিনে এনেছিলাম। ডাক্তারের পরামর্শে। ভেবেছিলাম তুমি কিছুটা হলেও শান্তি পাবে। স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তা না—আরও খারাপ হল। তুমি এখন ভাবো ওটাই আসল। ওটাই আসল জগৎ। ওকে নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকো।

—মজা করছ তাই না!

—না, না মিনু। মজা করছি না। ও নেই। কতবার বলব ও নেই। আজ থেকে বহু বছর আগে ও চলে গেছে। আর কোনও দিনও আমাদের মধ্যে ফিরবে না। তা না হলে যে ছেলে সারাক্ষণ এত মা-মা করত, সে এত বছরে একবারও এখানে আসত না!—

—বলে এগিয়ে গেলেন মানিকবাবু—ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়ে সুইচটা বন্ধ করতেই মুহূর্তে ঘরের পরিবেশ বদলে গেল। ঘরের মধ্যে থেকে ছেলের ত্রিমাত্রিক ছবি, শব্দ সব মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

উনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—দেখলে কোথায় গেল আমাদের বাবু!

সামনে দেখো শুধু সাদা দেওয়াল। কই, আছে আর কিছু! শুধু একটা সুইচ—আর সব মিলিয়ে গেল। ওর চেহারা, ওর শব্দ।

দেওয়ালের উপরে পরম স্নেহের সঙ্গে হাত বোলালেন মানিকবাবু। সাদা দেওয়ালের উপরে আবছা হয়ে আসা রং-পেন্সিলের দাগগুলোতে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে বলে উঠলেন,—কেউ নেই। শুধু সাদা দেওয়াল। আমরা বহু দিন আগেই ওকে—আর বলতে পারলেন না মানিকবাবু। দেওয়ালের দিকে মুখ করে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলেন।

ওনার স্ত্রী এবার সোফা ছেড়ে উঠে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার পরে দেওয়ালের উপরে হাত বুলিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলেন—তোমার চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে বাবু চলে গেল।—বাবু! বাবু! কোথায় তুই।—তার পরে মানিকবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—ও তো রোজ আসে। দেখবে আবার কাল আসবে। এখানেও একদিন আসবে। রিসার্চ শেষ হলেই। শুনলে না কথা দিল। তোমার কথা সব মিথ্যে, সব মিথ্যে।

ঠিক এসময় বাইরের দরজায় যেন বেলটা বেজে উঠল।

—কে? কে?—মিনু চেঁচিয়ে উঠল।

—সোফার উপরে বসে পড়লেন মানিকবাবু।

—বাইরে কেউ নেই। ও তোমার মনের ভুল।

বেলটা আবার বেজে উঠল। দরজায় ধাক্কার শব্দ। পরপর চারবার।

—বাবু! বলো বাবু ছাড়া আর কেউ কোনওদিন এ দরজায় এভাবে ধাক্কা দিয়েছে।

আবার দরজায় ধাক্কা। মিনু দরজার দিকে জোর পায়ে এগিয়ে যান। পিছনে পিছনে খানিকটা অবাক মানিকবাবুও এগিয়ে যান।

দরজার বাইরে এক অচেনা বছর পঁচিশেকের ভারী সুন্দর দেখতে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা ট্রলি ব্যাগ।

হঠাৎ করে হকচকিয়ে দিয়ে মিনুকে জড়িয়ে ধরল ছেলেটা। বলে উঠল—আমি ফিরে এসেছি মা। ফিরে এসেছি। ওরা আমাকে ফের প্রাণ দিয়েছে।

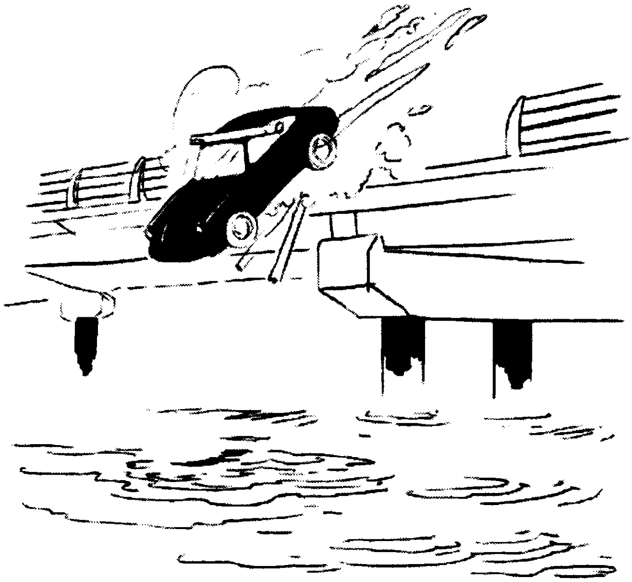
—বলে হাত দেখিয়ে বলে উঠল—এই চামড়া সরালে দেখবে স্টিলের

প্লেট। আমি রোবট হতে পারি। কিন্তু আসলে আমি তোমারই ছেলে। আমার ব্রেনই হল আমার পরিচয়। আর তোমার ছেলের সেই ব্রেনই ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে আমার রোবট শরীরে, যাতে আমি মানুষের মতো হই। আর তাই তো আমার একটাই পরিচয়—আমি সাত্ত্বিক—তোমাদের ছেলে সাত্ত্বিক।

তাই সবার আগে প্রাণ পেয়েই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এলাম।

বলে জুতো পরেই গটগট করে এগিয়ে গিয়ে সাদা দেওয়ালের সামনে বলে উঠল—এ দেওয়ালের রং সাদা নয়।

তারপরে ফিরে এসে জড়িয়ে ধরল মানিকবাবুকে। মানিকবাবু টের পেলেন হাতগুলো লোহার হলেও কেমন যেন আপনার। আর হাবভাব ঠিক যেন সাত্ত্বিকের মতো।



রাস্তা যখন শেষ

দমদম সেন্ট্রাল জেলের ৩ নং সেলের বাসিন্দা পুলক জোয়ারদারকে চেনে না এমন লোক বাংলা কেন ভারতেও কম। গত পাঁচ বছর জেলে থাকলেও খুব কম দিনই গেছে যেদিন পুলককে নিয়ে কোনো কাগজে কোনো রকম আলোচনা হয়নি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সব ঋতুতেই প্রায় একইভাবে পুলকের নাম খবরের কাগজের পাতায় ঘুরে ফিরে এসেছে—কখনো পক্ষে, কখনো বিপক্ষে।

অবশেষে আদালতের রায়। পুলকের মুক্তির আদেশ। পুলকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি। কোনো সাক্ষীও পাওয়া যায়নি যার এতটা বুকের পাটা আছে যে পুলকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। শেষে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। পাঁচ বছর বাদে সবরকম অপরাধ থেকে বেকসুর খালাস।

অবশ্য এটাও ঠিক যে কয়েকটা রাজনৈতিক দল পুলককে জেল থেকে বের করে নিজের দলে টানার জন্য যে ভাবে কোমর বেঁধে নেমেছিল তাতে ওর কৃতকর্মের কালো দাগগুলো মিডিয়ার কল্যাণে আস্তে আস্তে ফিকে হতে শুরু করেছিল।

একইসঙ্গে সাধারণ মানুষও ভুলতে শুরু করেছিল। এমনকী সেই ঘটনাটাও ভুলে গিয়েছিল যেখানে পুলক ও পুলকের পোষা গুণ্ডাবাহিনী বৈদ্যপাড়া গার্লস স্কুলের মধ্যে ঢুকে তিনজন শিক্ষিকা আর বারোজন ছাত্রীকে বোমা ছুড়ে মেরেছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সবই ভুলে যায়। বিশেষ করে পালের হাওয়া যখন মানুষকে ভুলতে বাধ্য করে। পুলককে সঙ্গে পেলেই অনেক পার্টির ভোটব্যাঙ্কে বড় প্রভাব পড়বে। তাই কে ওকে কাছে টানতে পারে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে।

তবু কেউ কেউ থাকে যারা এ ধরনের ঘটনা চট করে ভুলতে পারে না, যেমন লিপির বাবা। ওই স্কুলে বোমা বিস্ফোরণে যে বারোজন নিরাপরাধ ছাত্রী মারা গিয়েছিল তার মধ্যে লিপিও ছিল। হঠাৎ করে একটা দিন লিপির বাবা অশোকবাবুর জীবন পালটে গিয়েছিল। একটা বড় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল যা আর কখনো পূর্ণ হওয়ার নয়।

সেই দিনটাকে কোনোদিন ভুলতে পারেননি অশোকবাবু, ক্ষমা করতে পারেননি পুলককে। হয়তো আগামী দিনে আরও অনেক স্কুল পুলকের তাণ্ডবের শিকার হবে। দূর থেকে তাই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অশোকবাবু।

পুলকের জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কথা অনেকেই জানে। তাই জেলের বাইরে মিডিয়া, সাধারণ লোকের বেশ ভালোই ভিড়। পুলকের দলবলও মালা আর সংবর্ধনার নানা সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিল।

ঠিক সকাল দশটা বাজতে পাঁচে পুলক জেলের গেটের বাইরে বেরিয়ে এল। লম্বা-চওড়া চেহারা। ডান হাতের দু-আঙুলে ভিকট্রি সাইন দেখিয়ে মিনিট দুয়েক জেলের গেটের সামনে দাঁড়াল। ভক্তরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। অজস্র ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। পুলকের মুখে মুচকি

হাসি। দেখেই বোঝা যায় জেলের মধ্যেও যত্ন-আত্তির তেমন অভাব হয়নি। জেলের ভেতরে থেকেও বাইরের পৃথিবীটাকে চালাতে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি পুলককে।

অশোকবাবু নিরীহ লোক। কোনোদিনই পুলকের কাছাকাছি পৌঁছোতে পারবেন না। ওনার যন্ত্রণা, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কখনোই কেউ শুনতে পাবে না। এটা যেন হঠাৎ করে আরও বেশি করে মনে পড়ে গেল অশোকবাবুর। রাগে, আক্রোশে রাস্তায় পড়ে থাকা একটা ছোট পাথর তুলে পুলককে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় ওনার কাঁধে কে যেন হাত রাখল।

ঘাড় ঘুরিয়ে অশোকবাবু দেখলেন পাশে একটা ছোটখাটো লোক এসে দাঁড়িয়েছে। সে-ই হাত রেখেছে অশোকবাবুর কাঁধে। লোকটার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। উজ্জ্বল দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে কী ছিল কে জানে। তবে অশোকবাবু মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পেরে থেমে গেলেন। আস্তে করে হাতে তোলা নুড়ি পাথরটা রাস্তাতেই ফেলে দিলেন। লোকটা ওনাকে ছেড়ে সামনের ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

২

পুলক আর মিঃ খেমকা সুইমিং পুলের ধারে বসে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করছিল। পুলকের ছাড়া পাওয়া উপলক্ষ্যে পার্টি। মিঃ খেমকা সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী। পুলক যে বিশাল হাউজিং প্রজেক্টটা করতে চলেছে তা মিঃ খেমকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া ঠিকভাবে করা অসম্ভব। বিশেষ করে তা যখন বিতর্কিত জমির ওপর তৈরি হতে চলেছে। সে ব্যাপারেই আলোচনা হচ্ছিল।

পুলকের ডিনার পার্টিতে শুধু মিঃ খেমকা নন, প্রভাবশালী মন্ত্রী, আমলা, তথাকথিত সেলিব্রিটি, মিডিয়া, গুণ্ডাসমাজ সবেরই প্রতিনিধি

আছে। বাগানবাড়ির সামনের রাস্তায় জানা-অজানা অজস্র বিদেশি গাড়ির ভিড়। সিকিউরিটির বাড়াবাড়ি এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক ছাড়া কারোর পক্ষে এ বাড়ির দরজা পেরোনো সম্ভব নয়।

ঠোঁটের কোণে চুরুটটা ধরে মিঃ খেমকাকে লক্ষ্য করে পুলক বলে উঠল, ২০১৭ থেকে ২০২২—এই পাঁচ বছরে সত্যি সবকিছু অনেক বদলে গেছে। জেলে ছিলাম বলে বেরিয়ে এসে আরও বেশি করে বুঝতে পারছি। সব কিছুতেই আঙুলের ডিজিটাল ছাপ, থাম্ব প্রিন্ট। সই-সাবুদ ভ্যানিশ। পেপার ওয়ার্ক আর নেই। আগে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ফাইল যেত, টাকা গুঁজে দিতাম। খেল খতম। এখন সব ডিজিটালি। হাঃ, হাঃ।

মিঃ খেমকা চোখ দুটো বড় বড় করে ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপের হাসি এনে বলে উঠলেন,—তাতে কি আমার, আপনার কুনো অসুবিধে হয়েছে? টেকনোলজি টেকনোলজির জায়গায় আছে। আমরা আমাদের পথ করে নিয়েছি। আগে অনলাইনে ওসব কামকাজ সারতে হত, এখন অফলাইন। ঠিক বলেছি কি না—! অট্টহাসি করে উঠলেন মিঃ খেমকা।

তারপরে একটু থেমে মাটির উপরে পানের পিক ফেলে পুলকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,—ওসব পারমিশনের বাত হামার উপর ছেড়ে দিন। দো দিনে সব ডিসপিউট মিটিয়ে ফেলব। তা ছাড়া মিঃ বাগচীও তো আপনার বন্ধুলোগ আছে। ফাইল পটাপট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। একমাসের মধ্যেই সব গ্রিন সিগন্যাল।

একটু থেমে মিঃ খেমকা বললেন,—হ্যাঁ, কিছু লোকাল প্রবলেম আছে, ঝুট- ঝামেলা করতে পারে, তা সে তো আমার থেকে আপনার ভালো মালুম আছে তাদেরকে কী করে ঠান্ডা করতে হয়।

পুলক চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে মুচকি হেসে মিঃ খেমকার মন্তব্যে সায় দিল। ও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা এল। ঠিক সেই সময়েই ফোনে একটা মেসেজ এসেছে। মেসেজটা দেখে খানিকক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল পুলক। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে আপনমনে বলে উঠল,—আজকে যে তোমার দিন শেষ অরিজিৎ। আর কদ্দিন পালিয়ে

পালিয়ে বাঁচবে?

মেসেজ দেখে পুলকের হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করে মিঃ খেমকা বলে উঠলেন,—কোনো প্রোবলেম হল পুলকবাবু? কিছু হেল্প লাগবে?

—না, না। ঘরে অনেকদিন ধরে একটা ইঁদুর ঘোরাঘুরি করছিল। ট্র্যাপ বসিয়েছিলাম। মাউসট্র্যাপ। ধরা পড়েছে।

—সে তো আচ্ছা বাত আছে। এইসব ইঁদুর ভারী উৎপাত করে। সোব ক্লিন করে দিন। হাঃ হাঃ হাঃ। হামিও তো আপনার সঙ্গে আছি, না কি?

ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে পুলক বলে উঠল,—এক্সকিউজ মি ফর এ মিনিট।

দ্রুত পায়ে পার্টির ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে মেসেজটাতে আরেকবার মন দিয়ে চোখ বোলাল পুলক। অরিজিৎ-এর অ্যাড্রেসটা পাওয়া গেছে। অনেক অনেক দিন খোঁজাখুঁজির পর। এসেছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত সোর্স থেকে। একমূহূর্ত দেরি করা চলবে না। খুব তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। এই একটা লোকের জেদের জন্য পাঁচ বছর জেলের ঘানি টানতে হয়েছে। তা না হলে, কী ছিল না পুলকের সঙ্গে? সব রকমের পলিটিক্যাল সাপোর্ট, দেশের সবথেকে নামকরা ল-ইয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, টাকা, পুলিশ—যা যা দরকার সবই ছিল। শুধু একটা অত্যন্ত সাধারণ লোকের জন্য জেলের মধ্যে এতদিন কাটাতে হল পুলককে। ডেমোক্র্যাসি! চুরুটটা ছুড়ে বাগানে ফেলে বাড়ির পিছনের গেটের দিকে এগিয়ে গেল পুলক।

বিশ্বস্ত অনুচর হাবুলকে একবার ডেকে নিল পুলক। জানিয়ে দিল সে দরকারি কাজে বেরোচ্ছে এক ঘণ্টার জন্য। কাউকে জানানোর দরকার নেই।

পার্টিতে স্বাভাবিক সেন্সে আছে এমন লোকের সংখ্যা এখন কম। কেউ লক্ষ করার আগেই কাজ সেরে ফিরে আসা যাবে। কারণ, অরিজিৎ আবার যদি চোখে ধুলো দিয়ে পালায় তো ধরা মুশকিল হবে।

ড্রাইভার গণেশ গাড়ির সিটে বসেই ছিল। পিছনের সিটে উঠতে গিয়ে হঠাৎ পুলকের মনে হল গণেশকে সঙ্গে নেওয়াটা কি নেহাতই দরকার?

এসব ঘটনার যত কম সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখা যায় ততই ভালো। কখন কার কী মতিগতি হয় তা কি বলা যায়!' সঙ্গে যে ধাতব বস্তুটা আছে, সেটাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

আর তাছাড়া এই নতুন গাড়িটাতে ড্রাইভারের দরকারই বা কী? সকালবেলা কোম্পানির লোকেরা ডেমনস্ট্রেশনও দিয়ে গেছে। এর থেকে পারফেক্ট টাইমিং আর হতে পারে না। সত্যি, পাঁচ বছরে কত কিছুই পালটে যায়। জেলের ভেতরে বসে সব রকমের খবর পেলেও এটা পুলকের জানা ছিল না যে একদম ড্রাইভারহীন গাড়ি এসে গেছে কলকাতায়। অবশ্যই সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট করে শুধু গন্তব্যস্থানের অ্যাড্রেস দিলেই হল। গাড়ি ছুটে চলবে রাস্তার স্পিড লিমিট মিলিয়ে, অন্য গাড়ির সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রেখে।

ভাবা যায়! গাড়ি চালানোরই দরকার নেই। হঠাৎ করে সামনের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লেও গাড়ি ঠিক অ্যাক্সিডেন্ট বাঁচিয়ে জায়গা করে নেবে। যে লোকটা গাড়ি দেখাতে এসেছিল তাকে নিয়ে পুলক তিনবার নিজে গাড়ি চালিয়েছে। চালিয়েছে মানে চালকের আসনে বসেছে—এই আর কী! কারণ সত্যিই তো কোনো কাজ নেই। অ্যাড্রেস দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকো। গাড়ি ঠিক নির্দিষ্ট অ্যাড্রেসে গিয়ে তবে দাঁড়াবে। পুরো রাস্তা খুঁজে নেবে স্যাটেলাইট দেখে। কোনো রাস্তায় অসুবিধে, যানজট, থাকলে অন্য পথ বেছে নেবে।

পুলক নানান লোককে চেনে, নানান জায়গায় যায়। গণেশ ড্রাইভার হিসেবে যতই বিশ্বাসী হোক না কেন—ওরও তো চোখ আছে, কান আছে। বলতে গেলে পুলকের যাবতীয় কৃতকর্মের সব থেকে বড় যদি কোনো সাক্ষী থেকে থাকে, সে হল গণেশ। এখন সে আপদকেও বিদেয় করা যাবে। মনটা ভারী খুশি হয়ে উঠল পুলকের।

গণেশকে গাড়ি থেকে নামতে বলে ড্রাইভার-সিটে বসে সামনের মনিটরে সদ্য পাওয়া অ্যাড্রেসটা দিল পুলক। তারপর ইঞ্জিন স্টার্ট করতে গাড়ি নিজে থেকেই আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সিগন্যাল দিয়ে মাঝের লেন ধরল। পনেরো মিনিটের পথ। কলকাতায় থাকার মতো এত

বড় বোকামিটা অরিজিৎ যে করবে তা ভাবতে পারেনি পুলক। ওর কি বোঝা উচিত ছিল না যে পুলকের প্রথম টার্গেটই হবে ও?

আট বছর আগেকার কথা। রঘুগ্রামে একটা অনাথ-আশ্রম চালাত একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। 'স্বপ্ন' ছিল সংস্থার নাম। অরিজিৎ ছিল ওই সংস্থার কর্মাধ্যক্ষ। সংস্থার জমিটা নিয়েই গণ্ডগোল। গঙ্গার ধারের ওই জমিটাই দরকার ছিল পুলকের। অবশ্য ওটা ছিল পুরো প্লটটার একটা ছোট অংশ। ভারী সুন্দর জায়গা। ঘুম থেকে উঠে চোখ খুললেই সামনে গঙ্গা। বিজ্ঞাপনের ট্যাগলাইনটা এখনও মনে আছে—'গঙ্গাতীরে জমিদারি'।

সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। গণ্ডগোল বাঁধল ওই দশ একর জমিটা নিয়ে। কিছুতেই জায়গাটা ছাড়বে না—বহু পুরোনো অনাথ-আশ্রম নাকি! তাতে কী হয়েছে? অনাথ-আশ্রম গঙ্গার ধারে থাকার কী এমন দরকার? আরে বাবা, অনাথদের আছেটাই বা কী! আর পাশের বৃদ্ধাশ্রমটা? ওটারই বা কী দরকার?

তা যাই হোক, অরিজিৎ লোকটার সেই লজিক্যাল সেন্সটাই নেই। টাকার লোভটাও নেই। তাই বাঁকা আঙুলে ঘি তুলতে বাধ্য হল পুলক। অনাথ-আশ্রমে আগুন লাগিয়ে দিতে হল। বৃদ্ধাশ্রমে অবশ্য সেটাও করতে হয়নি। বুড়োবুড়ি গুলোর বাক্স-প্যাঁটরা ঘরের বাইরে ছুড়ে ফেলতেই—ব্যস!

লোকাল থানার ওসি মঞ্জুর হোসেন পুলকের দলেই ছিল। তাই কোনো অসুবিধেই হয়নি। পুরো ঘটনাটা অন্যভাবে সাজানো হল।

বাদ সাধল ওই লোকটা—অরিজিৎ। আর তারই জন্য অবশেষে পুলকের মতো একজনকেও জেলে যেতে হল। ভাবা যায়!

ঘুমই এসে যাচ্ছিল পুলকের। গাড়ি নিখুঁতভাবে অন্য গাড়ির পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে। কিছুই করার নেই। অনেক রাত হয়েছে। তাই এমনিতেও রাস্তায় গাড়ি খুব কম। রাস্তার দুধারে আলোগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে। দোকানপত্তর সব বন্ধ।

আচ্ছা, গাড়িটাকে ইচ্ছেমতো থামানো যায় তো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যায়। লোকটা তো বেশ কয়েকবার দেখিয়েছিল। হ্যাঁ, ড্যাশবোর্ডের ওই কালো

নবটা ঘোরালেই অটোম্যাটিক থেকে ম্যানুয়াল কন্ট্রোল, অর্থাৎ নিজের অধিকারে গাড়িকে নিয়ে আসা যাবে। তারপরে ওই লাল বাটনটা প্রেস করলেই গাড়ি সবথেকে কাছাকাছি নিরাপদ জায়গা খুঁজে দাঁড়িয়ে যাবে।

সত্যি, টেকনোলজি কোথায় এগিয়েছে! তাও আবার কলকাতার বুকে! পরে একদিন ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে আবার এ গাড়ি চড়তে হবে। হাতে গোনা তিন-চারজন মাত্র আছে কলকাতার বুকে যারা এরকম গাড়িতে চড়তে পেরেছে। গাড়ি দিতে এসে লোকটা তা-ই বলছিল। দেখার মতো উজ্জ্বল চোখ লোকটার। ও নাকি ওই কোম্পানির সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। সাদা শার্ট, লাল টাই পরে এসেছিল। আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা গাড়ির সেলসম্যান হয়ে গেছে।

হেসে বলেছিল লোকটা,—গাড়িটা চড়ে দেখবেন পুলকবাবু, কেন এত দাম! ভাঙাচোরা যেকোনো রাস্তাই হোক না কেন, কোথাও কোনো জার্কিং নেই। আর কমপ্লিট সেফটি। নিশ্চিন্তে কফি খেতে খেতে যেতে পারবেন গাড়িতে। সত্যিই তাই। লেন চেঞ্জ করে কী সুন্দর খেলনা গাড়ির মতো এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা! গাড়ির গতিরও হঠাৎ করে কমা-বাড়া নেই। নিখুঁতভাবে চালালে যেরকম হয় আর কী! নিঃশব্দ গাড়ির কাঁচের বাইরের কলকাতাটা এখনও যদিও অতীতেই পড়ে আছে।

হঠাৎ পুলকের মোবাইলটা বেজে উঠল। অচেনা নাম্বার থেকে কেউ ফোন করছে। পুলকের ফোনের এ নাম্বার খুব কম লোকের কাছেই আছে। ফোনটা রিসিভ করে পুলক ভারী গলায় 'হ্যালো' বলে উঠল।

—গাড়ি কেমন লাগছে স্যার?

—কে বলছ?

—স্যার, আমিই তো আপনাকে আজকে গাড়িটা ডেলিভারি দিলাম।

—ও বরুণ? খুব ভালো। কিন্তু তুমি কী করে জানলে যে আমি গাড়িতে আছি।

—তা আমি জানব না? আমিই তো আপনাকে অ্যাড্রেসটা পাঠালাম।

—মানে? একটু অবাক হয়ে পুলক ফের বলে উঠল,—কিন্তু যে নাম্বারটা থেকে মেসেজটা এসেছিল সেটা তো আমার চ্যালা বিল্টুর

নাম্বার। তুমি ওই ফোন থেকে মেসেজটা পাঠালে কী করে?

—আসলে ফোনটা আর বিল্টু—দুজনেই এখন আমার কাছে। হেসে ওঠে উলটোদিকের লোকটা।

—মানে? তুমি কে? অরিজিতের অ্যাড্রেস জানলে কী করে?

—বাহ্, আমার অ্যাড্রেস আমি জানব না? আমিই অরিজিৎ।

একটা অশ্রাব্য গালাগাল করে চেঁচিয়ে উঠল পুলক। কন্ট্রোল নেওয়ার জন্য কালো নবটা ঘুরিয়ে গাড়ি থামানোর লাল বাটনটা প্রেস করল পুলক। অবিলম্বে গাড়ি থামানো দরকার। কোনো ট্র্যাপে ফেলছে না তো?

কিন্তু গাড়ির স্পিড একবিন্দু কমল না। পাগলের মতো বারবার বাটনটা প্রেস করতে থাকল পুলক। অটোম্যাটিক থেকে ম্যানুয়াল মোডে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকল, যাতে গাড়িটা নিজের নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু গাড়ি একইভাবে চলতে থাকল, একই স্পিডে।

—অরিজিৎ, তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। আমি কে তুমি জানো না, আমার নাম পুলক। চিৎকার করে উঠল পুলক।

উলটোদিক থেকে হাসির আওয়াজ শোনা গেল।

—আমার কি হবে জানি না। তবে গঙ্গা আর গঙ্গাপ্রাপ্তি দুটোই আপনার থেকে খুব একটা দূরে নেই। আপনি কী করার চেষ্টা করছেন তা আমি জানি। কিন্তু এ গাড়ি এখন আর থামবে না। আপনি তিরিশের কমে গাড়ি চালান না বলেছিলেন না, তাই আমি সেরকমই সেটিং করে দিয়েছিলাম, যাতে একবার স্টার্ট করলে গন্তব্যস্থলে না পৌঁছোনো পর্যন্ত তিরিশের থেকে স্পিড না কমে। আর আপনিই আমার গাড়ির প্রথম কাস্টমার তো! তাই কিছু কিছু জিনিস ঠিকভাবে কাজ করছে কি না তা এখনও দেখা হয়নি।

একটু থেমে অরিজিৎ ফের বলে উঠল,—এই যেমন ব্রেক-এর কাজটা।

পুলক বিহ্বল হয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল গাড়িটা একটা ব্রিজের উপর উঠছে। ব্রিজটায় ওঠার জায়গায় নানান রকম ওয়ার্নিং সাইন আর ব্লক করার ব্যবস্থা আছে। সেগুলোর মধ্যে দিয়েই নিখুঁতভাবে পাশ

কাটিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। এই ব্রিজটা পুলকের তৈরি। বাজে কনস্ট্রাকশন মেটিরিয়াল দেওয়ার জন্য একবছর আগে ভেঙে পড়েছে। এখন আবার কাজ শুরু হয়েছে।

—আরে, এ কী! সামনে পথ কোথায়! চিৎকার করে উঠল পুলক। কিছুটা দূরে ব্রিজের পথটা শেষ হয়ে গেছে কাজ চলার দরুন।

—আহা, চিৎকার করছেন কেন? ওই অ্যাড্রেসটা তো গঙ্গার ঠিক মাঝামাঝিরই অ্যাড্রেস। দেখেছেন, আরেকটা ভুল করেছি। গাড়ির জিপি-এসটা শুধু শর্টেস্ট ডিসট্যান্সটাই দেখে, তাই না! রাস্তা আছে কি না, সে রাস্তায় কাজ হচ্ছে কি না, বা রাস্তা হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে কি না—তা আর চেক করে না। চুক চুক করে আওয়াজ করে উঠল অরিজিৎ।—বড় ভুল হয়ে গেছে দেখছি।

পাগলের মতো গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করল পুলক। দরজা খুলল না। ড্যাশবোর্ডের সব সুইচগুলো একটার পর একটা টিপে গেল পুলক। কোনোক্রমে যদি—নাহ্—গাড়ির স্পিড কমার কোনো লক্ষণ নেই।

ফের চিৎকার করে উঠতে গেল পুলক। কিন্তু গাড়িটা ততক্ষণে নির্মীয়মাণ ব্রিজের শেষ প্রান্ত থেকে ক্যারামের গুটির মতো ছিটকে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর নামতে শুরু করেছে নীচের দিকে। প্রায় দুশো ফুট নীচের গঙ্গার দিকে।



স্বাধীনতা

পুনিত-এর বাবার একটা আজব শখ ছিল। ভারতের জাতীয় পতাকা আঁকা। একটা পাটকাঠির উপরে কাপড়ে আঁকা পতাকা লাগিয়ে গ্রামের সব বাচ্চাদের বিলি করত স্বাধীনতার দিনে। বিনে পয়সায়। পুনিতও অবশ্য একটা পেত। তবে ওর একটু হিংসেই হত। কী দরকার বাকি সবাইকে বানিয়ে দেওয়ার! ওদের নিজেরই তো অবস্থা এত খারাপ। আর কত পরিশ্রম। ওদেরও বাবা আছে, তাই না!

তা বাবাকে জিগ্যেস করলে উত্তর পেত—বড় হলে বুঝবি। স্বাধীনতা বলে কথা। স্বাধীনতার দিনে সবার হাতে এই পতাকা থাকা দরকার। আর সবাই কি তোর বাবার মতো এত সুন্দর আঁকতে পারে! কী সুন্দর গেরুয়া আর সবুজ রংটা ফুটেছে দেখেছিস! আর পতাকার মধ্যে চক্রটা দেখেছিস! ঠিক ২৪টা দাগ থাকতে হবে ওর মধ্যে। ব্যাপারটা অত সহজ

নয় বুঝলি। স্বাধীনতার ব্যাপার।—বলে চুপ করে কী যেন ভাবত বাবা।

পরে আরেকটু বড় হলে পুনিতও বাবার সঙ্গে পতাকা বিলি করত। আর মাঝে-মাঝেই বাবাকে প্রশ্ন করত—বাবা স্বাধীনতা মানে কী?

বাবা হেসে বলত—আমি কি অত-শত বুঝি রে! তবে খুব বড় ব্যাপার। দেখিস না সবকিছু ছুটি থাকে। স্কুল ছুটি থাকে, অফিস ছুটি থাকে। এইদিন ভারত স্বাধীন হয়েছিল। তার আগে খুব দুষ্টু সাহেবরা আমাদের উপর খুব অত্যাচার করত। আমার ঠাকুরদাও তো অনেকদিন জেল খেটেছিলেন স্বাধীনতার জন্য। তাই তো আমার বাবারও আর পড়াশুনা হয়নি। ওঁনারা অন্য মাপের মানুষ ছিলেন। নিজেদের কথা ভাবতেন না। আমি তো শুধু পতাকা বানাই। পতাকা নিয়ে যখন হাঁটি, তখন মনে হয় ভয়ের কিছু নেই। আমার হাতেই এ দেশের দায়িত্ব। তাই কোনও অন্যায় যেন সহ্য না করি।

পুনিতের মাথায় এসব কিছুই ঢুকত না। দুদিন বাদে আবার একই প্রশ্ন করত। তা শেষে ওর বাবা খুব ভেবেচিন্তে বলল—গ্রামের পুরোহিত মশাই মানিকবাবু খুব পণ্ডিত লোক। আর ওঁনার তো অনেক বয়েসও হয়েছে। উনি নির্ঘাত জানবেন। ওনাকে জিগ্যেস করব গিয়ে।

ওরা তারপরে একদিন ভোরভোর মানিকবাবুর বাড়ি গিয়ে এ প্রশ্নটা করল। উনি তখন দাঁত ব্রাশ করছিলেন। প্রথমে প্রশ্নটা শুনে ব্রাশ মুখ থেকে পড়ে গেলেও খানিকবাদে সামলে উঠে বললেন—তোরা তো কিছুই দেখলি না! আমার এখনও মনে পড়ে সেদিনের কথা। আমরা সবাই মাঝরাতে বড়দের সঙ্গে বসে সেদিন রেডিওতে শুনেছিলাম। আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলছেন—আজ রাতে পৃথিবী যখন ঘুমোবে, স্বাধীন ভারত জেগে উঠবে।

সেকী আনন্দ চারদিকে! আমি তখন খুব ছোট। আনন্দে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছিলাম। এর বেশি কিছু আর মনে নেই। কিন্তু কথাগুলো এখনো মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়।

—তা দাদু, স্বাধীনতার মানে কী?—পুনিত আবার প্রশ্ন করে।

খানিকক্ষণ চুপ করে মানিকবাবু একটু যেন বিরক্ত হয়েই বলে

উঠলেন—এই যে নিজের ইচ্ছেমতো চলছি-ফিরছি, কেউ এসে হঠাৎ করে পেটাচ্ছে না, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না—এটাই স্বাধীনতা। তা তোদের কি মাথা খারাপ হল! সকাল সকাল বাবা-ছেলে মিলে চড়াও হয়েছিস এ প্রশ্ন নিয়ে! বলি তোদের কি কিছু এসে যায় এতে! খেতমজুরি করিস, এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ! ওসব যারা রাজনীতি করে তারা এসব ভাববে। তোরা তোদের কাজ কর।

ওরা খানিক বাদে বাড়ি ফিরে এল। পুনিতের প্রশ্ন আরো বেড়ে গেল। কিন্তু প্রশ্ন করার সাহস আর ছিল না।

এর কয়েকমাসের মধ্যে হঠাৎ যে কী হল, দু'দিনের জ্বরে পুনিতের বাবা মারা গেল। বাবা কি আগেই টের পেয়েছিল? তা না হলে কেন তার আগের দিন পুনিতকে পাশে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে বলবে—আমি চলে গেলে কাকার কাছে শহরে চলে যাস। পড়াশুনাটা ভালো করে করিস। আর পতাকাটা সঙ্গে রাখিস।

বাবা মারা যাওয়ার পর খুব কেঁদেছিল পুনিত। ওর মা আগেই মারা গিয়েছিল। গ্রামে আপনার বলতে আর কেউ রইল না। ওর কাকা শহরে একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। বাবা মারা যাওয়ার দিন কয়েক বাদে কাকা এসে ওকে শহরে নিয়ে গেল।

কাকার অবস্থাও বেশ খারাপ। তারপরে বড় শহর। খরচ অনেক বেশি। তাই থাকার জায়গা জুটলেও ওর পড়াশুনা আর হল না। রোজগারের খোঁজে ও একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। প্রথমে ভালো না লাগলেও পরে আস্তে আস্তে কাজটা ভালো লাগতে শুরু করল। চায়ের দোকানের পাশেই ছিল একটা বড় অফিস। আর সেখানে অনেক কমবয়সি ছেলেমেয়ে কাজ করে। ওর বেশ লাগে। কী সুন্দর জামাকাপড় পরে সবাই আসে। একসঙ্গে হইচই করে, আড্ডা মারে কাজের ফাঁকে। সবসময় মজায় থাকে।

চায়ের দোকান যার, তার নাম মুন্না। সেও বেশ ভালো লোক। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মজার মজার গল্প করে। তবু মাঝেমধ্যেই পুনিতের মন খুব খারাপ লাগে। ওর বয়স দশ। সারাজীবন কি এভাবেই কেটে যাবে

চায়ের দোকানে? ও কি আর কিছু করবে না? মাথার উপর দিয়ে প্লেন গেলেই মাথা তুলে দেখে। ওতে নাকি হুস্ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাওয়া যায়। ওকি কোনোদিন ওরকম প্লেন চড়তে পারবে? কে জানে!

কই ও তো ওর ইচ্ছে মতো কিছুই করতে পারে না। ও কি তাহলে স্বাধীন নয়!

ক'দিন বাদে মুন্নাদাকেও প্রশ্নটা করল পুনিত। ও ভেবেছিল মুন্নাদা হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু তা না। মুন্নাদা একজন কাস্টমারকে বেগুনি দিচ্ছিল।

গলার স্বর একটু নামিয়ে ওকে বলে উঠল—আমিও ঠিক জানি না। এটা খুব বড় শহর। যাকে-তাকে এসব প্রশ্ন করলে, কী ভাববে কে জানে! পুলিশও ধরতে পারে। লোক বুঝে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

সেদিন বিকেলের দিকে মুন্নাদা একটা স্যুট-টাই পরা লোকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল—ওনাকে জিগ্যেস করা যাক। আমি ওনাকে চিনি। বেশ ভালো লোক।

তখন বিকেলের আলো ফুরিয়ে এসেছে। ঘর ফেরা পাখিদের আওয়াজে কান পাতা দায়।

তা লোকটা প্রশ্নটা শুনে চায়ের প্লাস্টিকের কাপে একবার চুমুক দিল। তারপর সামনের গাছের পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে ধীরেসুস্থে বলে উঠল—ওই যে ওরা যেমন ইচ্ছে উড়তে পারছে, যেমন ইচ্ছে আওয়াজ করতে পারছে, সেটাই স্বাধীনতা। তার মানে অবশ্য এই নয় যে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারবে। ধরো তুমি তোমার চায়ের কাপটা আমার দিকে ছুড়ে মারলে, সেটা তো স্বাধীনতা নয়। সবকিছুই নিয়ম মেনে করতে হয়। তা না হলে সমাজ-দেশ সব ভেঙে যায়।

পুরোটা না বুঝলেও পুনিত-এর এই কথাটা বেশ মনে লেগেছিল। আর তাই রোজ বিকেলের দিকে ওই ঘর-ফেরা পাখিদের দিকে তাকিয়ে দেখত ও। কীরকম খেয়াল খুশিমতো ওরা উড়ে বেড়ায়। দেখতে দেখতে ওর মনে পড়ত ওদের ছোট বাড়িটার কথা। সরষের খেতের কথা! ওর

বন্ধুদের কথা! ওর বাবার রং করার তুলিগুলোর কথা।

রাতের বেলা যখন কথা বলার কোনো লোক থাকতো না, তখন পুনিতের খুব খারাপ লাগত। ওরও তো খেলতে ইচ্ছে করে, পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেসব করার কোনো উপায় তো নেই। তবে কোনো একটা দিন ও নির্ঘাত স্বাধীন হবে। আর তখন ঠিক ওই লোকটার মতো কথা বলবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে।

দেশ থেকে আসার সময় সঙ্গে করে বাবার তৈরি একটা পতাকা নিয়ে এসেছিল। রোজ রাতে তার উপরে খানিকক্ষণ হাত বোলাত। তার পরে মাথার কাছে নিয়ে শুত।

একদিন মুন্নাদা ওকে বলল—জানিস এই অফিসটাতে কাল স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বড় প্রোগ্রাম হবে। চারদিক তাই অত সাজিয়েছে। আমাদের দোকান তো কাল বন্ধ থাকবে। কিন্তু তুই আসিস। ওদের বলে অফিসে ঢুকে যাবি। ওরা তো তোকে রোজ দেখে। নির্ঘাত ঢুকতে দেবে। সব কথা জানতে পারবি তাহলে। দেখবি পতাকা তোলা হবে।

পুনিত তো শুনে খুব খুশি। তা সেদিন ভোর হতে না হতেই ওখানে হাজির। সঙ্গে সেই পতাকা। কিন্তু গেটের কাছে যেতেই অফিসের সিকিউরিটি এগিয়ে এল। ঢুকতে গেলে অফিসের কার্ড লাগবে। না থাকলে অফিসের কাউকে সঙ্গে থাকতে হবে। ও বেশ খানিকক্ষণ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকল। কিন্তু তারা কেউই পুনিতকে খেয়াল করল না। ঘণ্টা দুয়েক পরে ঢুকতে না পেয়ে ও ফিরে চলল। বাড়ির পথে।

ওর হাতে ধরা পতাকাটা সবাই কৌতূহলের সঙ্গে দেখছিল। ও কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে মাথার উপরে নাড়তে নাড়তে বাড়ির পথে হাঁটতে লাগল।

রাস্তায় অন্য দিনের মতো গাড়ির ভিড় নেই। অফিসপাড়া। বেশিরভাগই ছুটি। ফাঁকা রাস্তা। দু-চারজন হেঁটে যাচ্ছে। ওর সামনে কিছু দূরে এক কমবয়সি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ভালো পোশাক পরা। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে মেয়েটার পাশ ঘেঁষে থামল। গাড়ি থেকে দুটো লোক নেমে

মেয়েটার উপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। টেনে-হিঁচড়ে গাড়িতে টেনে তোলার চেষ্টা করছিল ওরা।

ওর কী মনে হল কে জানে! শুধু বাবার কথাটা মনে পড়ল।

—বুঝলি—এ পতাকা হাতে থাকলে কোনো কিছুতে ভয় লাগে না। কারণ মনে হয় আমার হাতে এদেশের দায়িত্ব।

ও চিৎকার করে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গুণ্ডাদুটোর উপরে। আশে-পাশে তো আরো লোক ছিল। তারা কেউ এগিয়ে এল না। লোক দুটোর গায়ে বেশ জোর। তবে পুনিতও অত সহজে হার মানতে নারাজ। যতবার লোকদুটো ওকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মেয়েটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ও ততবার ফের উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল ওদের গায়ে। কিছু লোক মজা দেখার জন্য জড়ো হচ্ছিল। খানিক বাদে গতিক সুবিধের নয় বুঝে লোকদুটো কোনওরকমে গাড়িতে গিয়ে উঠল। আর উঠেই জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল। তবে তার আগেই ওদের একজন একটা ছোরা দিয়ে বেশ কয়েকটা কোপ দিয়ে গেছে পুনিতের হাতের উপরে। রক্তে ওর পুরো হাতটা লাল হয়ে গেছে। মেয়েটার কিছু ক্ষতি হয়নি। ভয়ে রাস্তায় বসে পড়েছে। আর অবাক চোখে পুনিতের দিকে তাকিয়ে আছে। এইটুকু একটা বাচ্চা!

পতাকাটাও দূরে পড়ে গেছে। টানা-হ্যাঁচড়ায় ছিঁড়ে গেছে।

পুনিত রক্তে ভেজা হাতেই পতাকাটা রাস্তা থেকে তুলে চেঁচিয়ে উঠল—জয় হিন্দ্!

প্রথমবার মনে হল ও স্বাধীন। জ্ঞান হারানোর আগে ও যেন স্পষ্ট দেখতে পেল বাবার রং করার তুলির দাগ। গেরুয়া, সবুজ...



মিঃ পাই ও সেই ওষুধ

এরকম একটা কিছু যে হবে তা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। এমনকী, প্রাণও যে যেতে পারে তাও জানতাম। বলতে গেলে এর জন্য আমি-ই দায়ী। সম্পূর্ণ দায়ী। আরও একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমার।—বলে চুক্‌চুক্‌ করে দুঃখসূচক আওয়াজ করলেন মিঃ পাই।

কলকাতার এক নামকরা বেসরকারি হাসপাতালের কেবিনে গত দশদিন হাত-পা প্লাস্টার করা অবস্থায় পড়ে আছি। তার আগে পাঁচদিন দিল্লির একটা নামি হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি ছিলাম। ওখান থেকে প্লেনে করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

আমার এই অবস্থা কীভাবে হল, কেন হল—সেটা বলার আগে আমার এই পাগলাটে প্রতিবেশীর মন্তব্যটা শুনে যার পর নাই অবাক হয়ে বলে উঠলাম,—আপনি আগেই জানতেন? কীভাবে? পুরো খবরটা পড়েছেন?

মাথা ঘুরিয়ে পাশের টেবিলে রাখা খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

মিঃ পাই একটা চেয়ার আমার বেডের কাছে টেনে নিয়ে এসে বসলেন। তারপর বললেন,—শুধু ওই কাগজ! আপনার বীরত্বের খবর তো প্রায় সব কাগজেরই শিরোনামে।

কষ্টের মধ্যেও হেসে ফেললাম। বিনীতভাবে বললাম,—হ্যাঁ, মিডিয়া একটু বাড়াবাড়িই করেছে। না না, আমি সামান্য সাধারণ একজন মানুষ। নেহাতই অন্যায় সহ্য করতে পারি না, তাই!

—আসল কথাটা কি জানেন? আপনি আমার ওষুধটা খেয়েছিলেন চিংড়ির কাটলেটের সঙ্গে।

মিঃ পাই কেবিনের চারপাশে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললেন,—এ সবই এক্সপেরিমেন্টের অংশ অবিনাশবাবু! ওই যে ওষুধটা খাইয়েছিলাম না, তাতে ব্রেনের অ্যামিগডেলা বেশ কিছুদিন ঠিকঠাক কাজ করে না, ভয় ব্যাপারটাই থাকে না। তিরিশদিন পরে আস্তে-আস্তে এফেক্টটা কেটে যায়। ওই সময়টুকু ভয়ডর থাকে না, সৎসাহস বেড়ে যায়। তা ভাবুন তো, একটা ছোট্ট ওষুধের জন্য কি সাংঘাতিক ভালো একটা কাজ করে ফেললেন। আপনার নাম এখন লোকের মুখে মুখে। শুনলাম পাড়ার ক্লাবের নাম ওরা চেঞ্জ করে আপনার নামে রেখেছে 'অবিনাশ স্পোর্টিং ক্লাব'। মাংসের দোকানের নাম বদলে রেখেছে—'অবিনাশবাবুর প্রিয় পাঁঠার মাংস।'

—তবে ওরা যখন নামটা রেখেছিল, তখন ওরা ভেবেছিল অবিনাশবাবু মারাই যাবেন। কাগজে সেরকমই খবর বেরিয়েছিল কি না! মিঃ পাই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট গণেশ পাশ থেকে নির্বিকারভাবে বলে ওঠে। যথারীতি চোখে লাগার মতো সুসজ্জিত। সাদা শার্টের ওপর লাল টাই।

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। রাগে ফ্যাসফেসে গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম,—এ সবের মানে কী? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আপনি আমাকে ওষুধ খাইয়ে মারার উপক্রম করেছিলেন!

মিঃ পাই চোখ থেকে চশমাটা খুলে এক টুকরো কাপড় দিয়ে বেশ যত্ন করে মুছতে শুরু করলেন। তারপর বললেন,—না, না অবিনাশবাবু।

একদম উত্তেজিত হবেন না। বিজ্ঞানের জন্য একটু-আধটু আত্মত্যাগ তো করতেই হয়। বেঁচে ফিরেছেন, এই যথেষ্ট। আপনার শরীর এখনও বেশ খারাপ। আপনি রেস্ট নিন। আর সুস্থ হবার পরে একদিন আমার বাড়ি আসবেন। নতুন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করছি। দেখে আনন্দ পাবেন। তখন পুরো ব্যাপারটা আপনার মুখে ভালো করে শোনাও যাবে, কাগজে যা রং চড়িয়ে লেখে!

পাশ থেকে গণেশ বলে উঠল,—খবরের কাগজ পড়ে তো আমার ধারণা হয়েছিল আপনি মারাই যাবেন। আপনি যে বেঁচে আছেন, এটাই না দেখলে বিশ্বাস হত না।

মিঃ পাই উঠে দাঁড়ালেন। বলে উঠলেন,—আপনার স্ত্রী আর কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধু বাইরে অপেক্ষা করছেন। আমরা না বেরোলে ওনারা আসতে পারবেন না। অল দ্য বেস্ট। আশাকরি কোনও একদিন হাঁটতে-চলতে পারবেন। আর তা পারলে অবশ্যই আমার বাড়ি চলে আসবেন।

বেরোনোর আগে শেষ কথাটা যেন একটু দ্বিধা নিয়েই বললেন মিঃ পাই।

ঘটনার শুরু কোথা থেকে করব, তাই ভাবছি। মিঃ পাই-এর সঙ্গে আমার আলাপ কয়েক মাসের। যদিও আমার প্রতিবেশী গত দশ বছর ধরে। আগে আলাপ ছিল না। শুনেছি ওনার আসল নাম সমুদ্র বসু। কিন্তু 'পাই' সংখ্যাটা ওনার এত প্রিয় ছিল যে স্কুলের সব বই খাতাতে এবং অন্যান্য সব জায়গায় ওনার নামের পাশে 'পাই' লিখতেন। পরে এটাই ওনার নাম হয়ে দাঁড়ায়।

ভদ্রলোককে বাড়ির বাইরে প্রায় দেখাই যায় না। যা একটু দেখা যায়, ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট গণেশকে। তার যা হাবভাব, দেখে মনে হয় কোনও কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ। সবসময় সুট-টাই। মুখে প্রায় কথা নেই। বাজারে গিয়ে দরদাম করে না। আর কেউ যদি জিগ্যেস করে যে মিঃ পাই কেমন আছেন, তার উত্তরে শুধু বলে—খুব ভালো আছেন।

আচ্ছা, এখনকার দিনে কেউ খুব ভালো থাকে কি?

মিঃ পাই-এর সঙ্গে আগে যে একেবারেই দেখা হয়নি, তা নয়। কিন্তু ভদ্রলোক আলাপের আগ্রহ দেখাননি এতটুকু। লোকে ছাগল-গরু যেমন ভাবে দেখে সেরকম আমার ওপরে চোখ বুলিয়ে চলে গেছেন। আমিও সেধে আলাপ করতে চাইনি। শুনেছিলাম সায়েন্টিস্ট। কিন্তু কল্যাণগড়ের মতো জায়গায় একজন বিজ্ঞানী একা-একা বসে কি কাজ করেন সেটা তখন আদৌ আমার মাথায় ঢোকেনি।

চারমাস আগে মিঃ পাই-এর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হল। মানে, আলাপ করতেই হল আর কি! আমার কুকুর কুচোকে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে ওনার বাড়িতে পাওয়া যায়। কুচোর ওপর কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন বলে না বলেকয়ে কুচোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সাহসটা ভাবো একবার! আর কি সে এক্সপেরিমেন্ট! কীভাবে কুকুরের সঙ্গে বেড়ালের সম্পর্ক ভালো করা যায়—তার ওপর না কি গবেষণা! কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের বিজ্ঞানী এরকম কাজ করতে পারেন! তারপর থেকে কুচো পাড়ার বেড়ালগুলোর কথা আমার কথার থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে শোনে।

তারপরই একটু একটু করে আলাপ হয়। যতবার ভাবি দূরে-দূরে থাকব, ততবারই কীসের এক অজানা টানে ওনার বাড়িতে গিয়ে হাজির হই।

আসলে আমার এই রোজকার জীবনে বৈচিত্র্যের এত অভাব যে, পাশের বাড়ির এই অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং ভদ্রলোকের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করার কোনও উপায়ই নেই। ভদ্রলোক যে পাগলাটে, তা নিয়ে যেমন কোনও সন্দেহ নেই, তেমনই বড় মাপের বিজ্ঞানী এটা নিয়েও কোনও সন্দেহ নেই।

এবার আসল কথায় আসি, বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি, একটা হলুদ-সাদা মোটাসোটা বেড়াল আমার পিছু নিচ্ছে। আমি যেখানেই যাই সঙ্গে সঙ্গে যায়। বাড়ির গেট পেরিয়ে বেরোলেই কোথা থেকে এসে উদয় হয়। গলায় একটা কালো বেল্ট। দেখে মনে হয় কারো পোষা। মাঝে মাঝে মিউ মিউ করে ডাকে। কাছে ডাকলে কোলে চড়ে বসে। গায়ে হাত বোলালে আরামে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। যতক্ষণ বাইরে থাকি, সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

বেড়াল জিনিসটা কোনওদিন আমার তেমন প্রিয় ছিল না। কিন্তু এ বেড়ালটার প্রতি বেশ মায়া পড়ে যাচ্ছিল। সেদিন পাড়ার ভটচায্যিদা বললেন,—ভালো পোষ মেনেছে তো বেড়ালটা! সারাক্ষণ দেখি সঙ্গে সঙ্গে

ঘোরে। বেড়াল কিন্তু সাধারণত এতটা পোষ মানে না। খুব ভালো জাতের বেড়াল হবে নিশ্চয়ই।

সেদিন মুচকি হেসে চলে এসেছিলাম। কিন্তু মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই কিছু একটা রহস্য আছে। মিঃ পাই-এর বাড়িতে গিয়ে কথায় কথায় এ কথাটা তুলতেই মিঃ পাই বললেন,—এতে কোনও রহস্যই নেই। বেড়ালটা যাতে আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, সেটা তো আমারই গবেষণার ফল। তা না হলে আপনার মতো একজন লোকের পিছু নিতে ওর ভারী বয়েই গেছে!...হলদি!...হলদি!

দুবার ডাকতে না ডাকতেই দেখি সেই বেড়ালটা কোথা থেকে মিঃ পাই-এর ড্রয়িংরুমে এসে হাজির। সোফায় ঠিক যেখানে আমি বসে আছি, সেখানে ঠিক আমার পায়ের কাছে, এসে গা লাগিয়ে বসল।

অবাক হয়ে বললাম,—এটা আবার কী করে সম্ভব? মিঃ পাই মুচকি হেসে বললেন,—বিজ্ঞানের দ্বারা সবই সম্ভব।

তবে অত জটিল বিজ্ঞান আপনাকে বোঝানোর ধৈর্য বা সময় কোনওটাই আমার কাছে নেই। ভাবুন, যদি ওই হলদি সব সময় আপনার গা থেকে মাছের গন্ধ পায়, তাহলে কি হবে? অন্য বেড়ালরা কিন্তু সে গন্ধ পাবে না। কি? ব্যাপারটা এবার সহজে বোঝা যাচ্ছে—কেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে?

—তা এটা করে কি লাভ?

চোখের সামনে থেকে একগোছা চুল সরিয়ে মিঃ পাই বলে উঠলেন, —আপনাকে একটু স্টাডি করছিলাম, গত কয়েকদিন । আপনি মানুষটা কেমন—সৎ, না অসৎ, সাহসী না ভীতু, কি করতে ভালোবাসেন, আড্ডাবাজ কি না, ঝগড়া করেন কি না—ইত্যাদি। বেড়ালটার গলায় যে বেল্টটা দেখছেন না—তাতে মাইক্রোফোন আর অডিয়ো ট্রান্সমিটার বসানো আছে। আপনার প্রত্যেকটা কথা রেকর্ড হয়েছে।

বলে একটু থেমে গণেশের দিকে তাকিয়ে বললেন,—গণেশ রেকর্ডিংগুলো সব যত্ন করে রাখা আছে তো? সব কথা কিন্তু এখনও শোনা হয়নি।

—মানে? আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! আপনার বিরুদ্ধে আমি আইনি ব্যবস্থা নিতে পারি, তা জানেন? এতো স্পায়িং—অনধিকার প্রবেশ!

—আহা, চটছেন কেন? এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন সায়েন্স অ্যান্ড ওয়্যার। ভাবুন তো, বিড়ালের মতো একটা প্রাণীর মাধ্যমে যদি অপরাধীদের ওপর নজর রাখা হয়, কেমন হবে। অপরাধী টেরও পাবে না। অথচ সব খবরাখবর নিয়ে নেওয়া যাবে। আর বেড়ালের কোনও অভাব নেই। যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। চট করে কারুর মন জয় করে নিতে পারে। আদর্শ স্পাই। তাই না?

এইসব কথার মধ্যে একটা বিশাল চেহারার চিংড়ির কাটলেট আমার প্লেটে এসে গেছে। একজন সুসজ্জিত বাবুর্চি সুন্দর ট্রেতে করে আমার সামনের টেবিলে রেখে গেছে। সেটা দেখে মাথাটা একটু ঠান্ডা হল।

কাটলেটটা খেতে যাব, তার মধ্যে মিঃ পাই বলে উঠলেন,—আপনি লোক ভালো, কিন্তু বেজায় ভীতু। বাড়িতে স্ত্রীকে প্রচণ্ড ভয় পান। রাস্তায় গুণ্ডার ভয় পান। বাসে অ্যাক্সিডেন্টের ভয় পান। সাপে ভয় পান, ভূতে ভয় পান। ঠান্ডা লেগে জ্বর হবে, সেজন্য শীতকে ভয় পান। জলে ভয় পান।...আচ্ছা, এত ভীতু হলে চলবে কী করে? সেদিন বাজারের রাস্তায় অচেনা একটা সুটকেস পড়েছিল দেখে বোমা ভেবে আপনি যেভাবে উলটোদিকে ছুট দিলেন—হলদিও আপনার সঙ্গে ছুটে পেরে ওঠেনি।

মিঃ পাই একটু থেমে ফের বলে উঠলেন,—এই যে সেদিন বাজারে এক গুণ্ডা একজন বৃদ্ধকে মারল, আপনি কিছু করলেন? চুপচাপ পাশের দোকান থেকে পটল আর বেগুন কিনে ভয়ে মাথা নীচু করে পালিয়ে গেলেন। নাহ্, এত ভয় পাওয়া মোটেও ঠিক নয়। তাই আমাকেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

—কি? কি ব্যবস্থা? অবাক হয়ে বলে উঠি।

—নাহ্, এখনই বলব না। আগে কাজ হোক। তা, চিংড়ির কাটলেটটা ভালো লাগল তো? কলকাতা থেকে আনানো।

চিংড়ির কাটলেট আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেটা মিঃ পাই-এর জানা। খেয়েই রাগ ভুলে গেলাম। কোনও কথাই গায়ে লাগল না। আরও খানিকক্ষণ গল্প করার পর সেদিন মিঃ পাই-এর বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছিলাম।

এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা কি হয়েছিল। চিংড়ির কাটলেটে ওষুধ!

হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে আরও কুড়িদিন লাগল। তারও দিন দশেক পর গায়ে একটু বল পেয়ে মিঃ পাই-এর বাড়ি গেলাম।

প্রায় দশ একর জায়গার ওপর ওনার বাড়ি। গেট পেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে ইট ফেলা এক চিলতে পথ বাড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে বেল বাজানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলল। গণেশ—যথারীতি সাহেবি পোশাকে। মাথায় একটা কালো টুপি। এটা আগে কখনও ওকে পরতে দেখিনি। আমাকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসাল। তারপরে বলল,—স্যার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আসছেন। আপনি একটু বসুন। আপনি যে আজ আসবেন, তা উনি আগে থেকেই জানেন। তাই অনেক কষ্ট করে দেড় ঘণ্টা সময় বের করেছেন।

—উনি জানলেন কী করে যে আমি আসব? অবাক হলাম।

গণেশ কোনও উত্তর দিল না। মুচকি হেসে শুধু বলল,—স্যারকেই জিগ্যেস করবেন।

—তা, তুমি ঘরের মধ্যে টুপি পরে আছ যে!

—আসলে স্যার একটা পাকা চুল তোলার যন্ত্র তৈরি করেছেন। মাথার ওপর হেলমেটের মতো পরতে হয়। আমার ওপরে পরীক্ষা করছিলেন, দেখুন তার ফল—

বলে গণেশ কাঁদোকাঁদো মুখে টুপিটা একটু সরাল।

একী! সারা মাথা জুড়ে কেউ যেন খাবলে খাবলে চুল ছিঁড়ে নিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে গণেশ বলে,—যতদিন না সব চুল ওঠে, এ টুপি পরে থাকতেই হবে।

—হ্যাঁ, তা ঠিক!

সত্যি বলতে কি সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষাও খুঁজে পেলাম না।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর থেকে বেড়াল হলদিকে আর দেখতে পাইনি। অবশ্য আমিও ফেরার পর থেকে তেমন কোথাও যাইনি যে ও আমার পিছু নেওয়ার সুযোগ পাবে। আমি যে আসব তা মিঃ পাই কীভাবে আগে থেকেই টের পেলেন সেটা মাথায়

এল না।

এসব ভাবছি আর চারদিকের আলমারিতে ঠাসা বইয়ের ওপর চোখ বোলাচ্ছি—এমন সময় মিঃ পাই ঘরে এসে ঢুকলেন। সাদা পাজামার ওপর নীল পাঞ্জাবি। মুখে যথারীতি একগাল হাসি। এসে আমার উলটোদিকের সোফায় বসে বাঁ-পায়ের ওপর ডান পা-টা তুলে বলে উঠলেন,—এবার বলুন, আপনার এ ক'দিনের অভিজ্ঞতা। কীরকম লাগল?

—হাসপাতালের অভিজ্ঞতা?

—না, না, হাত-পা ভাঙার আগের অভিজ্ঞতা। সেদিন যে আমার বাড়ি থেকে চিংড়ির কাটলেট খেয়ে বেরোলেন, তার পরের কথা। আচ্ছা আমিই না হয় ধরিয়ে দিচ্ছি।

মিঃ পাই একটু থেমে ফের বলে উঠলেন,—তার পরের দিন ছিল সোমবার। ঠিক তো? আপনি গজার সাইকেলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শঙ্করকে চড় মারলেন।

—হ্যাঁ, আমাদের পাড়ার একটা মেয়েকে খারাপ কথা বলেছিল বলে আমি এগিয়ে গিয়ে প্রতিবাদ করি। তারপরেও বাঁদরামো না থামানোয় চড় মারি।

—ভাবুন তো—আগে কি এটা পারতেন? শঙ্করকে এখনাকার সবাই ভয় পায়। ওর কাছে ছোরা-বন্দুক এসব থাকাও অস্বাভাবিক ছিল না। নানা ধরনের অসামাজিক কাজের সঙ্গেও ও যুক্ত থাকে। অন্য সময় হলে কি করতেন? ওই সব কথা না শোনার ভান করে অন্যদের মতো আপনিও পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন। ভাবতেন—কি দরকার ঝামেলায় জড়ানোর। কিন্তু সেদিন তা করলেন না। প্রতিবাদ করলেন। তাতেও কাজ না হওয়ায় চড়-ই মেরে দিলেন। শাবাশ! শঙ্কর এতটাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল আপনার ওই সাহস দেখে, তাড়াতাড়ি পালিয়ে গিয়েছিল ওখান থেকে।

—হ্যাঁ, সত্যি। আমার যে এত সাহস আছে তা আমি নিজেও জানতাম না।

—তার পরদিন ট্রেনে আপনি কি করলেন? মনে পড়ে?

—হ্যাঁ, তা আর পড়বে না! ওই তো বনগাঁ লোকালে একটা পকেটমার উঠেছিল। হঠাৎ আমার চোখে পড়ে গেল। একজনের মানিব্যাগ নিয়ে লাফ

দিল চলন্ত ট্রেন থেকে। ট্রেন ছাড়ার ঠিক পরে। গুমা স্টেশনে।

—আর আপনিও তাকে ধাওয়া করে—কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্লাটফর্মে লাফিয়ে নামলেন। প্রায় একশো মিটার ছুটে ছেলেটাকে ধরলেন। শুধু ধরলেন তাই না—তাকে মারধোর না করে মিষ্টি খাওয়াতে নিয়ে গেলেন।

—আর বলবেন না, ছেলেটার বয়স বছর পনেরো। দেখেই মায়া পড়ে গেল। আমি ওকে বোঝাতে শুরু করলাম যাতে ও চুরি ছেড়ে দেয়, পড়াশোনা করে। লেখাপড়ায় ভালো হলে ওকে এসব খারাপ লাইনে আর থাকতে হবে না। সেসবই বোঝালাম। ছেলেটার কাছ থেকে মানিব্যাগটা উদ্ধার করে যার পকেটমার হয়েছিল তার কাছে পাঠিয়েও দিয়েছিলাম পরে।

—বেশ করেছেন। তা, আপনার কি মনে হয়? আগে কোনওদিন এরকম করতে সাহস করতেন কি? চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ? পকেটমারের পিছু ধাওয়া? তবে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ থেকে গোপালের গল্পটা যেভাবে ছেলেটাকে শোনালেন—যেভাবে টানা আধঘণ্টা উপদেশ দিলেন—তা কিন্তু সত্যিই বাড়াবাড়ি।

—ঠিকই বলেছেন। আগে হলে নিজের মানিব্যাগ হারালেও অমন করতাম না।

—এবার আসি আপনার মানালির ঘটনায়। তার পরদিন আপনার পুরো ফ্যামিলি গেলেন সিমলা-মানালি বেড়াতে। সেটা আগেই পরিকল্পনা করা ছিল। তা, আপনার মুখেই শোনা যাক পুরো ঘটনাটা।

—আমরা মানালির একটা হোটেলে ছিলাম। মানালি থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে একটা বিখ্যাত শিবের মন্দির আছে। সেখানে সকালে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পাশের একটা নামকরা বড় দোকান থেকে একটা পশমিনার শাল কিনি। অনেক দাম বুঝলেন! পনেরো হাজার টাকা।

হোটেলে ফিরে এসে সেদিনের স্থানীয় খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা খবরে চোখ পড়ল। দ্বিতীয় পাতার বড় খবর। মানালি-চণ্ডীগড়-কাশ্মীর-লাদাখ জুড়ে বড় একটা অপরাধী চক্র কাজ করছে। এরা পশমিনার শাল বলে অতি সাধারণ শাল বিক্রি করে ক্রেতাদের ঠকায়।

শুধু শাল নয়, এরকম আরও অনেক নকল জিনিস এরা আসল বলে বিক্রি করে। সে টাকায় তারা সন্ত্রাসবাদে মদত জোগায়। এসব টাকাই হাত ঘুরে যায় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে, যারা কাশ্মীরে নানান ধরনের উগ্রপন্থী কর্মকলাপের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আছে। কিন্তু পুলিশ এদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না, কারণ উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাব। কেউই এত বড় চক্রের বিরুদ্ধে গলা তুলতে সাহস পায় না।

—পড়েই আপনি বুঝতে পারলেন যে আপনিও ঠকেছেন, তাই তো? কিন্তু নিজে ঠকার থেকেও আপনার মনে হল কীভাবে এ ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায়। কীভাবে সন্ত্রাসবাদীদের মদত জোগানো বন্ধ করা যায়। তাই তখনই গিয়ে থানায় অভিযোগ করলেন।...ওরা তো আপনাকে অনেক সাবধান করেছিল। বারণ করেছিল এসব করতে।

—হ্যাঁ, তা তো করেইছিল। এফ.আই.আর করতে চায়নি। কিন্তু আমি রাজি হইনি, বুঝলেন। পুরো চার ঘণ্টা থানায় বসেছিলাম। অবশেষে বিকেল পাঁচটায় ওরা রেডি হল। তখন দিনের আলো কমে এসেছে। দুটো পুলিশ ভ্যান নিয়ে ওই দোকানটার উদ্দেশ্যে বেরোলাম।

মাঝে একটা জায়গায় পাহাড়ের ওপর ভ্যান দুটো দাঁড়াল। সবাই দুড়দাড় করে নেমে কোথায় চলে গেল। খানিকবাদে একটা লোককে ধরে নিয়ে এল। পরে বুঝেছিলাম সে-ই দোকানের মালিক। তারপর আমরা গেলাম সেই দোকানটায়। শিব মন্দিরের উলটোদিকে বিশাল বড় দোকান। ঢুকেই ওরা যা করল, তা কি বলব! পুলিশের অমন মারমূর্তি আমি আগে কখনও দেখিনি।

—দোকানের সব জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল। দোকানের দুজন কর্মচারীকে লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করল। ঠিক তো?

—আশ্চর্য! কী করে জানলেন বলুন তো এসব! ঠিক তাই। উহ্ সে কী মার! আমিই গিয়ে শেষে কর্মচারীদের বাঁচালাম। ওরা তখন একবাক্যে আমার পুরো টাকা ফেরত দিয়ে দিতে চায়। শুধু এফ.আই.আরটা তুলে নিতে হবে।

—কিন্তু, আপনি তা করেননি। আপনি টাকাও ফেরত নেননি। আপনি চেয়েছিলেন ওদের বিরুদ্ধে, এ ধরনের বড় ক্রিমিন্যাল দলের বিরুদ্ধে

ঠিকমতো ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তারপর যখন থানা থেকে ফিরছেন, রাতের রাস্তায় দুজন লোক আপনাকে ধরে বেদম উত্তম-মধ্যম দিল।

—হ্যাঁ, অন্ধকার রাস্তা। সেদিন রাতে থানা থেকে হোটেলে ফিরছি, হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে হঠাৎ ধাক্কা দিল। সামলাতে না পেরে রাস্তায় পড়ে যেতেই লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করল। আলো থাকলে মজা দেখিয়ে দিতাম। কিন্তু হঠাৎ করে আক্রমণ করায়, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম।

—আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। আপনাকে যারা মারল, তারাও কিন্তু পুলিশেরই লোক। যদিও সাধারণ পোশাকে ছিল। আপনাকে মেরে ফেলাই বোধহয় এদের উদ্দেশ্য ছিল। তা সে যাই হোক। ভাগ্য ভালো ছিল। তাই এক সহৃদয় ব্যক্তি এ ঘটনাটা দেখে ফেলে। ওই ব্যক্তি আবার ঘটনাচক্রে বিচারক। তা তাঁরই জন্য আপনি উদ্ধার হন। তিনিই আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। পুলিশে খবর দেন। খবরটা মিডিয়ার সামনে আসে। তারপর এই চক্রের কয়েকজন বড় পাণ্ডা ধরাও পড়েছে। সে তো আপনিও জানেন। এ সবই সম্ভব হল শুধু আপনার জন্য।

—আপনি এত কিছু জানলেন কী করে মিঃ পাই? কাগজেও তো এত বিশদভাবে বেরোয়নি।

মিঃ পাই আরেকবার বিগলিতভাবে হাসলেন। বলে উঠলেন,—আপনাকে আমি সেদিন আমার কয়েকটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা শুনিয়েছিলাম। আপনি কোনওটাই বিশ্বাস করেননি। অথচ আপনার শনি খারাপ যাচ্ছে বলে যে আংটিটা দিয়েছিলাম—সেটা পরতে একমুহূর্তও দেরি করেননি। ওটার মধ্যে লং ডিস্ট্যান্স অডিয়ো ট্রান্সমিটার বসানো ছিল। আপনার সব কথা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

সত্যি বলতে কি—আপনাকে ধরে ওরা যখন পেটাচ্ছিল, আমার তো বেশ খারাপই লাগছিল। আসলে বুঝতেই তো পারছেন, ওষুধটা কাজ করছে কিনা—তা তো আমার জানা দরকার। ওই ওষুধের জন্যই তো আপনার স্বভাবে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। আপনি সাহসী, পরোপকারী হয়ে উঠেছেন। ওটা আমারই আবিষ্কার। আগেরবার যাকে দিয়েছিলাম, তার উপরে ঠিকঠাক কাজ করেনি। সে রাতারাতি সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, ভাবুন তো!

বলে একটু থেমে মিঃ পাই গণেশকে প্রশ্ন করলেন,—ওনার আর কোনও খোঁজ পেলে?

গণেশ মাথা নাড়ল,—না স্যার। পুরো নিখোঁজ।

—এই—এই আংটিটা!—আমি এখনই খুলে ফেলব। আমাকে না বলে, না জানিয়ে কথা শোনা হচ্ছিল। বলে আংটিটা আঙুল থেকে বার করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আংটিটা আঙুলে এমনভাবে বসে গেছে, সহজে বেরোল না।

মিঃ পাই হেসে বলে উঠলেন,—আপনার শনির দশা আংটিটা না থাকলে কোনওভাবেই কাটবে না। শুনলাম ওদের দল কলকাতাতেও পৌঁছে গেছে। আপনার খোঁজে। এত টাকা লোকসান! এত বড় ব্যবসা বন্ধ! ভাবুন তো! কল্যাণগড়ের খোঁজ পেতে আর ক'দিনই বা লাগবে।

যাক গে, ঘাবড়াবেন না। ওর মাধ্যমে আপনার খবরাখবর পাব। কিছু একটা নিশ্চয়ই করা যাবে। আমি তো আছি-ই। গণেশও আছে। কি বলো গণেশ?

একটু থেমে আমাকে বোধহয় একটু সান্ত্বনা দিতেই মিঃ পাই বলে উঠলেন,—ভাবুন তো কত বড় আবিষ্কার। এই একটা ওষুধের দৌলতে কয়েকদিনে আপনি পালটে গিয়ে কত ভালো ভালো কাজ করে ফেলেছেন। মোটে তিরিশ দিনে। এরকম যদি সবাইকে পালটে দেওয়া যেত—এ পৃথিবীটা কত ভালো হত—তাই না! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিঃ পাই।

একটু থেমে ফের বলে উঠলেন,—গণেশ—আজকে অবিনাশবাবুর চিংড়ির কাটলেটটা আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন বলো তো? তাড়াতাড়ি করো। ভেতরে খবর নাও।

গণেশ কিছু বলার আগে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম,—না,না, এই তো সবে বাড়ি থেকে খেয়ে বেরোলাম। কিছু খাব না।



অচেনা হাত

অনিলিখা খুব অন্যমনস্কভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর বলল, এরকম যদি হত যে, আমাদের বাঁ-হাতটা যা করতে চায়, ডানহাতটা তাতে বাধা দেয়, বাঁ-পা-টা যা করতে চায়, ডানপা-টা তার ঠিক উলটো করতে চায়, তা হলে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত তাই না?

অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। আগে হলে বলতাম অকালবর্ষণ। এখন আর বলি না। প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনা দিনকে দিন যেন বেড়েই চলেছে। তা না হলে, পুজো গেল, এখনও এরকম বৃষ্টি!

অনিলিখা আমাদের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বলল, যা বৃষ্টি হচ্ছে, দরকারি কাজগুলো যে সারব তার উপায় নেই। বৃষ্টিটা কমলেই বেরোতে হবে।

আরে রোববারে এই বৃষ্টির দিনে আবার কেউ কাজের কথা ভাবে

নাকি? চেয়ারে আধশোয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল, তাও আবার কলকাতায় বসে! তা হঠাৎ করে কী একটা কথা যেন বলল অনি? বাঁহাত আর ডানহাত। দু'হাতের মধ্যে বিরোধ। সেরকম আবার হয় নাকি? ছোটদের একটা গল্প পড়েছিলাম, একটা কয়োটকে নিয়ে। খানিকটা এরকমই। শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাবে সে সবচেয়ে দরকারি। আর তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বেজায় ঝগড়া। শেষে এজন্য কয়োটকে মরতে হয়েছিল। তা ঘটনাটা কী? একটু খুলে বলো তো।

নাহ, সে কথা থাক। অন্য একদিন হবে, অনেক কাজ আছে, অনিলিখা ওঠার উপক্রম করল।

আমিও সবার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, কেন, আজকেই বলো না। এরকম বৃষ্টির দিনেও যদি তোমার সময় না হয়, তবে আর কবে হবে? এমনিতেই তো তোমার দেখা আজকাল আর পাওয়াই যায় না অনিলিখাদি! আজ এখানে, কাল সেখানে, বলো না কী বলছিলে।

অনিলিখা চুপ করে বসে কী যেন ভাবল। ডানহাতে পরা ঘড়িটা একবার চট করে দেখে নিল। তারপর টেবিলের উপরে প্লেটে রাখা একটা পাঁপড়ভাজা হাতে তুলে নিয়ে কামড় দিয়ে বলে উঠল, একবছর আগের কথা। তোদের মনে আছে বোধ হয়, গত পুজোর ঠিক আগে ইতালি থেকে ফিরেছিলাম। দু'মাস মতো ছিলাম সেখানে। ইতালি বলতে আমরা সাধারণত রোম, পিসা, মিলান এসব জায়গাই বুঝি। আমি কিন্তু গিয়েছিলাম অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত একটা শহরে। নাম জেনোয়া। খুব পুরোনো বন্দর শহর। কলম্বাসের জন্মস্থান। সমুদ্রপথে বাণিজ্যে প্রায় হাজার বছর ধরে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে এই শহর।

ওখানে পৌঁছোনোর পর প্রথম কয়েকদিন স্টেশন-লাগোয়া একটা হোটেলে ছিলাম। হোটেলটা ভালোই ছিল। কিন্তু দু'বেলা হোটেলের খাবার কি বেশিদিন ভালো লাগে! তাই এক-দেড়মাসের জন্য যদি কোনও ভালো ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া যায়, তার সন্ধানে ছিলাম। কিছুদিন বাদে অফিসের কোলিগ একটা বাড়ির খোঁজ দিল। অফিস থেকে একমাইল হাঁটা পথ। বাড়িটা দেখে মোটামুটি পছন্দ হয়ে গেল। তারপরে বাকি দেড়মাস ওই ফ্ল্যাটেই ছিলাম।

বাড়িটা সম্বন্ধে বলার আগে তোদের জেনোয়া শহরের চরিত্রটা একটু বুঝিয়ে বলি। ইতালির অন্য পুরোনো শহরগুলোর মতো এখানেও পাথর দিয়ে বাঁধানো সরু-সরু রাস্তা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে থমকে দাঁড়িয়ে দেখার মতো পুরোনো দিনের বাড়ি। তাক লাগানো স্থাপত্য। ছড়িয়ে থাকা হলুদ, গোলাপি, কমলা বাড়ি। সবুজ আর নীল খড়খড়ির জানলা।

তা এই পুরোনো বাড়িগুলোর ভিড়ে এই বাড়িটাও দিব্যি মিশে যায়। অন্তত একশো বছর পুরোনো তো হবেই। বড় রাস্তার উপর গেট। গেট থেকে ঢুকে ডানদিকে বাড়ির দরজা। সে দরজা পেরোলেই চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি উপরে উঠে গিয়েছে। পাশে একটা বহু পুরোনো দিনের লিফ্‌ট। দুটো লোহার দরজা টানলে আর উপরে ওঠার সুইচটা কয়েকবার টিপলে সাড়া মেলে। হঠাৎ ঘড়াং করে আওয়াজ হয়। বোঝা যায় লিফ্‌ট উঠতে শুরু করেছে। গতি দেখলেই বোঝা যায় যে, এই লিফ্‌টটা যিনি বসিয়েছিলেন তাঁর জীবনে অন্তত কোনও তাড়া ছিল না। আমার ফ্ল্যাটটা দোতলায়। লিফ্‌টের দুটো গেট খুলে বেরিয়ে এলে বাঁদিক-ডানদিকে দুটো ফ্ল্যাট। বাঁদিকের ফ্ল্যাটটা ছিল আমার ওই দেড়মাসের আস্তানা।

তা বাড়িটার পুরোটাই কি ভাড়া দেওয়া ছিল? জিগ্যেস করলাম।

না, চারতলা বাড়ি। একতলাটা বাড়িওয়ালার নিজের। বাকি প্রত্যেক তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। সিঁড়ির দু'পাশে। আমার ফ্ল্যাটে ঢুকলেই সামনে ড্রয়িংরুম। বাঁ-দিকে একটা সরু প্যাসেজ চলে গিয়েছে। প্যাসেজের ডানদিকে পরপর দুটো বড় বেডরুম। বাঁদিকে বাথরুম, কিচেন আর একটা ছোট স্টোররুম। ফ্ল্যাটে বিশাল-বিশাল খড়খড়ির জানলা। তারপরে কাচ। তবে খড়খড়ি খোলা অত সোজা ছিল না। দুটো জানলা দিয়ে মাঝেমধ্যে সামান্য আলো উঁকি দিত। এমনিতেও বাইরে প্রায় সবসময় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ফ্ল্যাটে অমাবস্যার অন্ধকার কাটাতে প্রায় সারাদিনই আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। মাঝেমধ্যে দিন আর রাতের তফাতটা বুঝতে রান্নাঘরের কাচের জানলার বাইরে চোখ রাখতে হত। এখানেই শুধু ঘোরানো কাচের জানলাটাকে খড়খড়ির আড়ালে রাখা হয়নি। ওই জানলা দিয়ে খুব ভাল যে দৃশ্য দেখা যেত তা নয়। এটা ছিল বাড়ির পিছনের দিক। এক চিলতে বাগান। শুধু বাড়িওয়ালার একতলার ফ্ল্যাটের মধ্যে দিয়ে

যাওয়া যেত। এ বাগানে কয়েকটা মাঝারি সাইজের গাছ, কিছু ফুলের টব গোল করে রাখা। মাঝে সামান্য একটু সিমেন্ট বাঁধানো জায়গা। একধারে জঞ্জাল ফেলার ডাস্টবিন। মোদ্দা কথা, এমন কিছু দৃশ্য নয় যে হাঁ করে তাকিয়ে থাকব। কিন্তু সেটাই হল একদিন।

ও বাড়িতে থাকতে শুরু করার ছ'সপ্তাহ পরের ঘটনা। রবিবার ছুটির দিন, রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি মুখগোমড়া আকাশ। নীচের দিকে তাকাতেই চোখ পড়ল একজন মধ্যবয়সি ভদ্রমহিলার উপরে। বাগানে একটা অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায়। হাতে একটা বই। ইতালিতে সুন্দরী মহিলার অভাব নেই। কিন্তু ওঁকে তাঁদের মধ্যেও আলাদা করে অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যাবে। এককথায় অসামান্য সুন্দরী, ছাইরঙা ট্র্যাকসুটের উপরে একটা আকাশি নীল সোয়েটার পরা। উজ্জ্বল সোনালি চুল। চোখ, নাক, মুখ কাটা-কাটা। মুখে একটা অস্বাভাবিক স্বর্গীয় স্নিগ্ধতা। দেখে মনে হয়, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে।

ইনিই কি বাড়িওয়ালি? লুসি মাতারাজ্জি? বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় ওঁর সই, নাম দেখেছি। কিন্তু এজেন্টের মাধ্যমে হওয়ায় সরাসরি যোগাযোগ হয়নি। ঠিক করলাম, পরে একদিন গিয়ে আলাপ করব। এমন একজনের সঙ্গে আলাপ না করাটাই ভুল হবে। তা তার জন্য অবশ্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না।

দু'দিন পরের ঘটনা। অফিস থেকে ফিরতে সন্ধে ছ'টা। কিছু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। রাস্তা ভেজা। একটা কালো মেঘ হামাগুড়ি দিয়ে মাথার উপর এগিয়ে আসছে। আবার বৃষ্টি এল বলে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের হলুদ আলোগুলো সবে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। রাস্তা থেকে বাড়ির মেন গেটটা খুলতেই দেখতে পেলাম, ঠিক আমার আগেই ওই মহিলা বাড়ির ভিতর ঢুকছেন। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হেসে বললেন, বুয়োনা সেরা। কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

আমিও হেসে একই রকম সৌজন্য দেখালাম। ভদ্রমহিলা আবার বললেন, তোমার ফ্ল্যাটে কোনও অসুবিধে হলে আমাকে জানিও।

আমিও জানালাম কোনও অসুবিধে নেই। ফ্ল্যাটে যদিও প্রচুর অপ্রয়োজনীয় আসবাব আছে, তার মধ্যে দিয়ে হাঁটাচলা বেশ দায়। খড়খড়িগুলোও

ঠিকমতো খোলে না। কিন্তু এসব তো আর প্রথম আলাপেই বলা যায় না। আর থাকবও তো মাত্র ক'দিন।

চলো আমার সঙ্গে একটু কফি খাবে।

প্রথম আলাপেই কফি খেতে যাওয়াটা কি ঠিক? তাই আপত্তি জানালাম। কিন্তু ভদ্রমহিলা আপত্তি শুনলেন না। প্রায় জোর করেই ওঁর ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন।

পুরো একতলা জুড়েই ওঁর ফ্ল্যাট ভারী সুন্দর করে সাজানো-গোছানো। দামি কাঠের আসবাব। লেদার সোফাসেট। বেশ কয়েকটা ইন্ডোর প্লান্টও রয়েছে। দেওয়ালে বড়-বড় ইতালিয়ান ফ্রেস্কো পেন্টিং। অবাক হয়ে দেখছি, ভদ্রমহিলা পাশ থেকে বললেন, বেশির ভাগই আমার আঁকা।

পেন্টিংগুলো অসাধারণ। তা আপনি কি প্রফেশনাল আর্টিস্ট?

আমি ফ্লোরেন্সের আকাদেমি অফ আর্টস থেকে ছবি আঁকা শিখেছি। কিন্তু এটা আমার মূল পেশা নয়। নেশা বলতে পারো। এখানে জেনোয়া ইউনিভার্সিটিতে আমি ফিজিক্স পড়াই। আর সময় পেলেই আঁকতে বসে যাই।

তা আপনি এখানে একাই থাকেন?

হ্যাঁ, একাই থাকি।

আমাকে সোফায় বসিয়ে ভদ্রমহিলা রান্নাঘরে গেলেন। সামনের ফ্রেঞ্চ ইজেলে রাখা একটা বড় অয়েল পেন্টিং। একটু খেয়াল করতেই বুঝলাম পিছনের বাগানের। ছবির মাঝখানে সেই সিমেন্টের বেদি। বাঁদিকে একটা ছোট মেপ্‌ল গাছ। তার পাশে একটা ছোট ফুলগাছ। তাকে কেন্দ্র করেই যেন আঁকাটা। ভারী সুন্দর বেগুনি রঙের ফুল এই গাছটায়। আর ছোট-ছোট লাল ফল। ছবিতে গাছটাকে ঘিরে একটা মাকড়সার জাল। তাতে যেন বৃষ্টির ফোঁটা আটকে আছে। অদ্ভুত সুন্দর তবে ছবিটা দেখে মনে হল অসমাপ্ত।

মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম, পায়ের শব্দে ঘোর কাটল। ভদ্রমহিলা ট্রেতে করে খাবার আর কফি নিয়ে ঢুকলেন।

আপনার এই আঁকাটা ভারী সুন্দর।

হ্যাঁ, এখনও শেষ হয়নি। আরও কয়েকদিন লাগবে। শুধু ছুটির দিন

পেলেই বসতে পারি। অন্যদিন তো আর আঁকা হয় না।

এটা তো আপনার পিছনের দিকের বাগানটা, তাই তো?

লুসি যেন একটু দ্বিধা করে বলে উঠলেন, আসলে এখানকার বেশির ভাগ বাড়ির লাগোয়া বাগান প্রায় একই রকম। কোনও না-কোনও গাছ থাকবে, সিমেন্টের বেদি থাকবে। তা যাক্‌গে। এই কেকটা খেয়ে কীরকম লাগল বলো তো। বাড়িতে বানানো। বলে প্লেটটা সামনের টেবিলের উপর রাখলেন।

প্রায় একঘণ্টা ছিলাম সেদিন। এত বিদুষী ও বিনয়ী মহিলা খুব কমই দেখা যায়। শনিবার পুরো একটা দিন উনি একটা ওল্ড এজ হোমে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সঙ্গে কাটান। রোববার দিনটা কাটান বই পড়ে আর ছবি এঁকে। সব মিলিয়ে ওই একঘণ্টা আলাপের রেশ আমার সঙ্গে রয়ে গেল। আবার কোনও একদিন দেখা করতে আসার কথা দিয়ে সেদিন বেরোলাম।

এতটা শুনে বিশ্বজিৎদা গলা খাঁকরে বলে উঠল, ইতালির সব বাড়িতে একইরকম বাগান, সিমেন্টের বেদি, মেপ্‌ল গাছ, গল্পের এই অংশটুকু কিন্তু ঠিক হজম হল না।

শুনে অনিলিখা মুচকি হেসে বলল, থাক! মন দিয়ে শুনছ যে, এটুকু অন্তত বোঝা যাচ্ছে। তবে ঠিকই বলেছ, ওই কথাটা আমারও একটু অদ্ভুত লেগেছিল। আর-একটা জিনিসও খুব অদ্ভুত লেগেছিল।

লুসি বাঁ-হাতটা প্রায় ব্যবহারই করছিলেন না। কফি আর কেক নিয়ে যখন রান্নাঘর থেকে এলেন, তখনও ওই ভারী ট্রে-টা শুধু ডানহাতেই ধরে ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল যে, বাঁ-হাতে কোনও অসুবিধে নেই তো! প্যারালিসিস জাতীয়? তা না হলে শুধু একহাতে একটা বড় ট্রে নিয়ে আসা একটু অস্বাভাবিক।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম তা নয়। কারণ আমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ছবিটার উপরে তুলির টান দিচ্ছিলেন মাঝে-মাঝে বাঁহাত দিয়ে।

ডানহাতটা অন্যদিকে সরানো।

এর ঠিক দু'দিন পরের ঘটনা। অফিসের দিন। বেলা বেশ ছোট হয়ে গিয়েছে। সকাল সাতটাতেও অন্ধকার। চারদিকের বাড়িগুলোয় আলো

জ্বলছে। এর মধ্যে রেডি হয়ে অফিসে বেরতে বেশ কষ্টই হয়। তবু সেদিন আকাশ পরিষ্কার ছিল। রান্নাঘরে ব্রেকফাস্টের আয়োজন করছিলাম। হঠাৎ নীচ থেকে কিছু একটা ভাঙার আওয়াজ পেলাম। দেখি আমার জানলার পাল্লাটা সামান্য খোলা, কখনও খুলে বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছি। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। লুসি বাগানের চেয়ারে বসে আছেন। ডানহাত দিয়ে বাঁ-হাতের কবজি জোর করে ধরে রেখেছেন। বাঁ-হাতটা যেন সেই বাধা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছে। আঙুল তুলে সামনের ফুলগাছটার দিকে নির্দেশ করছে। ছবির সেই ফুলগাছটা, যাতে বেগুনি রঙের ফুল। বাঁ-হাতটা বারবার উপরের দিকে উঠে আসছে আর ডানহাতটা আবার জোর করে সেটাকে নামিয়ে চেয়ারের হাতলে ধাক্কা মারছে। চেয়ারের নীচে ভাঙা কাপ, ডিশ। নির্ঘাত হাত থেকে পড়ে গিয়েছে আর তারই আওয়াজ আমি পেয়েছি।

অবাক হয়ে দেখছি, হঠাৎ দেখি লুসি উঠে দাঁড়ালেন। দু-হাতের মধ্যে এই যুদ্ধে ওঁর সারা শরীর কাঁপছে। প্রায় ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। রাস্তার ধারে বাড়ি, বাইরে গাড়ি চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে নীচের তলায় কী হচ্ছে তা বোঝা খুব মুশকিল। ঘরে ঢোকার পর কোনও শব্দ পেলাম না।

এই ঘটনার কথা আমি কাউকে বলিনি। কারও শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার কথা অহেতুক অন্য কাউকে বলার প্রয়োজনই বা কী! অফিসের মধ্যে একটা ক্যাফে আছে, কফি মেশিনে নিজেই নানা ধরনের কফি তৈরি করে নেওয়া যায়। আমি কফি নিয়ে এক চুমুক দিয়েছি, হঠাৎ পাশ থেকে জিওভানির গলা শুনলাম।

'বাড়িটা কেমন লাগছে অ্যানি?'

এই অফিসে সবাই আমাকে অ্যানি বলে ডাকতে শুরু করেছে। কেন জানি না, বোধ হয় ওদের ইতালিয় নামের কাছাকাছি হবে। জিওভানির দিকে মুখ ঘোরালাম।

'ভালো, বেশ ভালো। বাড়িওয়ালির সঙ্গেও আলাপ হয়েছে, বেশ ভালো ভদ্রমহিলা।'

প্রসঙ্গত বলে রাখি, জিওভানিই আমাকে ওবাড়ির সন্ধান দিয়েছিল।

জিওভানি আমার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব ভালো মহিলা। আমার সঙ্গে অবশ্য খুব বেশি আলাপ নেই। কিন্তু একই কথা সবার মুখে শুনেছি। খুব নাম করা ফিজিসিস্ট। ওর লেখা বেশ কয়েকটা বইও আছে।'

তাই? তা জানতাম না তো। তা উনি তো একা থাকেন?

ওঁর হাজব্যান্ড সুইস আল্পসে স্কি করতে গিয়ে মারা যান। অ্যাভালাঞ্চে। বডিও পাওয়া যায়নি। খুবই দুঃখজনক ঘটনা।

তা, লুসি তখন সঙ্গে ছিলেন না?

না। উনি কোনও একটা দরকারি কাজে এখানেই ছিলেন। এটা প্রায় পাঁচ বছর আগের ঘটনা। তখন খবরের কাগজে ঘটনাটা খুব বড় করে বেরিয়েছিল। ওঁর হাজব্যান্ডও খুব বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। নামকরা ডাক্তার। নেফ্রোলজিস্ট। এর দেড় বছর পরে ওঁর ছেলে মারা যান রোড অ্যাক্সিডেন্টে। বুঝতেই পারছ, এ ধরনের খবর তো আর চট করে ভোলা যায় না। কখন কার ভাগ্যে যে কী থাকে বলা মুশকিল।

তা তুমি এ-খবরটা পেলে কী করে?

পারিবারিক সূত্রে ওঁর ছেলের মৃত্যুর খবরটা পেয়েছিলাম। লুসি আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় হন। তা তো জানোই।

ওঁর হাজব্যান্ডের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল?

তেমন কিছু না। দু-একবার পার্টিতে দেখা হয়েছে। ওঁকেও ভারী সুন্দর দেখতে। দেখার মতো কাঁধ পর্যন্ত সোনালি চুল। তেমনই অমায়িক।

অনিলিখা একটু থামল। চা-শিঙাড়া নিয়ে কাজের মাসি ঘরে ঢুকছে। বংশীর দোকানের মাংসের শিঙাড়া। তাই গল্পে একটু বাধা পড়ল। মিনিট পাঁচেক বাদে অনিলিখা ফের বলতে শুরু করল, এর পরের ঘটনাটা ঘটল কলকাতায় ফিরে আসার কয়েকদিন আগে। অফিস ফেরত ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি আলো জ্বলছে না। অথচ বাইরের প্যাসেজে আলো জ্বলছে। কোনও এমসিবি ট্রিপ করে থাকতে পারে। কিন্তু কোথায় সুইচবোর্ড আছে খুঁজে পেলাম না। কয়েকদিনের জন্য আসা, টর্চও নেই হাতের কাছে। অন্ধকারে ফ্ল্যাটের মধ্যে খানিকক্ষণ এদিকওদিক হাতড়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নীচে গিয়ে লুসির সঙ্গে কথা বলাই ঠিক হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে লুসির ফ্ল্যাটের ডোরবেল বাজালাম। মিনিটদু'য়েক পরে লুসি বেরিয়ে এলেন। চোখমুখ দেখে মনে হল খুব ক্লান্ত। তবু আমাকে দরজা থেকে ফিরে যেতে দিলেন না। ওঁর চেনা এক ইলেকট্রিশিয়ানকে ফোন করে আমাকে প্রায় জোর করে ড্রয়িংরুমে এনে বসালেন।

'তোমার ডিনার হয়েছে? আমার সঙ্গে ডিনার করে যাও। ব্রকোলি দিয়ে স্যালমন মাছ বেক করেছি। ইলেকট্রিশিয়ান আসতে আধঘণ্টা তো লাগবেই। অতক্ষণ তুমি অন্ধকার ফ্ল্যাটে বসে কী করবে?'

আমি বিশেষ প্রতিবাদ করলাম না। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। একটু যে বাইরে ঘুরে আসব তার উপায় নেই। ফ্ল্যাট অন্ধকার। এই অবস্থায় লুসির সঙ্গে গল্প করে মাঝের সময়টা কাটানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ইতালির রাজনীতি নিয়ে খানিকক্ষণ কথা হল। তারপর লুসি রান্নাঘরে গেলেন রান্নার বাকি অংশ শেষ করতে। আমি এতক্ষণ গল্পে মশগুল থাকায় খেয়াল করিনি। ক্যানভাসের সেদিনের সেই ছবিটা আর ওখানে নেই। এদিক-ওদিক খুঁজতে চোখ পড়ল পাশের কাগজ ফেলার বাস্কেটে। বেশ কয়েকটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো উঁকি মারছে। একটা বের করতেই বুঝলাম এটা সেই ছবিরই ছেঁড়া একটা অংশ। কী এমন ব্যাপার হতে পারে যে, লুসি নিজের আঁকা এত সুন্দর একটা ছবি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারেন!

সবক'টা টুকরো টেবিলের উপর রেখে জিগস পাজলের মতো একটার সঙ্গে একটা জুড়ে ফেললাম। প্রায় কুড়িটা টুকরো, কিন্তু জিগস পাজলের অভ্যাস থাকায় জুড়তে সময় লাগল না। আর জোড়ার পরেই চমকে উঠলাম। এত সুন্দর ছবিটাতে বেখাপ্পা ভাবে একটা অংশ জোড়া হয়েছে। মোরগের ঝুঁটির মতো বেগুনি ফুলওয়ালা ওই গাছটার তলায় একটা লোক শুয়ে আছে, আর তার শরীরের উপর ছড়িয়ে পড়েছে ওই ফুল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওই অংশটা পরে আঁকা হয়েছে। লোকটার মুখ অন্যদিকে সামান্য ঘোরানো। লোকটার কাঁধ অবধি সোনালি চুল দেখে চমকে উঠলাম।

তা এতে চমকে ওঠার কী আছে? বিশ্বজিৎদা বলল।

চমকে উঠেছিলাম জিওভানির কথাটা মনে করে। ছবিটাতে কি লুসি

ফ্রান্সিসকোকেই আঁকতে চেয়েছিলেন? কিন্তু হঠাৎ করে গাছের তলাতেই বা কেন?

'চিয়াও' লুসির সম্বোধনে মাথা ঘুরিয়ে দেখি লুসি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এত মন দিয়ে জোড়া দেওয়া ছবিটা দেখছিলাম যে, লুসি কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়ালই করিনি। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। এ যেন অন্য লুসি। মুখটা ফ্যাকাসে সাদা। চোখের দৃষ্টিতে যেন রাগ আর বিস্ময়।

আমি কোনও রকমে বলতে পারলাম, 'আসলে ছবিটা এত সুন্দর, খোঁজ করতে গিয়ে চোখ পড়ল বাস্কেটে।'

'না, না, সে ঠিক আছে,' লুসি যেন মুহূর্তে ফের স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছেন।

'আসলে ছবিটা এত কষ্ট করে আঁকার পরে মনমতো না হলে তখন খুব খারাপ লাগে। এটাও তাই। একদম পছন্দ হয়নি, তাই ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। রান্না শেষ, চলো খেয়ে নিই।'

লুসির কথা শুনে আমার খুব অবাক লেগেছিল। নিজের সৃষ্টিকে এভাবে কেউ নষ্ট করে দিতে পারে! যেভাবে কুচি-কুচি করে ছিঁড়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড রাগের মাথায় ছেঁড়া। তা আমি এ নিয়ে কোনও কথা না বাড়িয়ে ডিনারের উদ্দেশে এগোলাম।

সেদিন ডিনারের খানিক পরেই ইলেকট্রিশিয়ান এসে গিয়েছিল, তাকে নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছিলাম। খানিকক্ষণের মধ্যে আলোও ফিরে এসেছিল। কিন্তু আমি লুসির ওই চোখের দৃষ্টিকে ভুলতে পারছিলাম না। কেন জানি না, লুসির তাৎক্ষণিক রিঅ্যাকশনটা আমার ভালো লাগেনি।

সেদিন রাতে লুসির হাজব্যান্ড ফ্রান্সিসকোর উপর ইন্টারনেটে খোঁজখবর নিলাম। পাঁচ বছর আগের ঘটনা। স্কি করার জন্য একটা গ্রুপের সঙ্গে সুইস আল্পসে গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার আগের দিন রাতে ভারী বরফপাত হয়েছিল। যেখানে ওঁরা স্কি করছিলেন সকালে সেদিন হঠাৎ করে অ্যাভালাঞ্চ হয়। ওঁদের গ্রুপের দু'জনের মৃতদেহ পাওয়া গেলেও, ওঁকে পাওয়া যায়নি। এতদিন বাদে, এখনও পাওয়া যায়নি। অবশ্য এধরনের

দুর্ঘটনায় মাঝেমধ্যে মৃতদেহ পাওয়াই যায় না। বরফের তলায় চাপা পড়ে যায়।

পুলিশও এবিষয়ে বিশেষ কিছু সন্দেহ করেনি। তবে একটা রহস্য ছিল। ফ্রান্সিসকোকে সেদিন সকালে কেউ স্কি করতে যেতে দেখেনি। আর তার আগের দিন ফ্রান্সিসকোর বাড়ি থেকে নাকি খবর এসেছিল আর্জেন্টিনি ফিরে আসার জন্য। সে ব্যাপারে ফ্রান্সিসকো এক বন্ধুকে বলেওছিল। তবে লুসি সে কথা অস্বীকার করেন। বাড়ির দিক থেকে কোনও কারণই ছিল না যার জন্য ফ্রান্সিসকোকে জরুরি তলব করার দরকার ছিল।

তারপর এত বছর কেটে গিয়েছে। কেস ক্লোজড। লুসিকেও সন্দেহ করার কোনও কারণ পাওয়া যায়নি। সহেলি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। হঠাৎ করে নড়েচড়ে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, তার মানে লুসি ওর হাজব্যান্ডকে মার্ডার করে ওই ফুলগাছের তলায় পুঁতে দিয়েছিল? আর তাই ছবিতে ভুল করে এঁকে ফেলেছিল। পরে খেয়াল হতে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলেছিল, আর সেটা তুমি দেখে ফেলায় মাই গড! তা, তারপর তুমি কী করলে?

অনিলিখা মুচকি হেসে বলে উঠল, এই তো। মার্ডার মিস্ট্রি বেশি পড়ার ফল। তবে তুই ঠিকই বলেছিস। আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছিল। আর তাই সেই রাতেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। সেইসঙ্গে আর-একটা কথাও বলে রাখি যেটা তোদের জানা দরকার। তা হল, অ্যালিয়েন হ্যান্ড সিনড্রোম। লুসির ক্ষেত্রে বাঁ-হাতটা ছিল অ্যালিয়েন হ্যান্ড।

মানে? ওই হাতটা লুসির কন্ট্রোলে ছিল না?

ঠিক তা নয়। আমাদের মস্তিষ্কের বাঁদিক আর ডানদিকের মধ্যে পাওয়ার স্ট্রাগল হল এ অসুখের মূল কথা। এটা একটা বিরল ধরনের অসুখ। তবে হলে খুব বিপদ। মস্তিষ্কের বাঁদিকের নিয়ন্ত্রণে থাকে ডানহাত আর ডানদিকের নিয়ন্ত্রণে থাকে বাঁহাত। তাই ঝগড়া বেধে যায় বাঁ-হাত আর ডানহাতের মধ্যে। সাধারণত বামমস্তিষ্ক বেশি শক্তিশালী বলে এক্ষেত্রে ডানহাতই জিতে থাকে।

লুসি যে এরকম একটা বিরল অসুখে ভুগছে তা আমার মনে হয়েছিল। আর তাই এটাও মনে হয়েছিল যে, ওর অতীতের কোনও অপরাধের সাক্ষ্য

বহন করছে ওর নিজেরই ডানমস্তিষ্ক আর বাঁহাত।

ডানহাতের এই কৃতকর্ম ডান মস্তিষ্ক ও বাঁহাত মেনে নিতে পারেনি। তাই সবকিছু চাপা দেওয়ার পরেও উনি ভুল করে বাঁহাতে এঁকে ফেলেন এমন একটা ছবি যা ওঁর অতীতের কৃতকর্মের সাক্ষ্য বহন করে। আর ডানহাত সে ছবি তাই ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ছবি ছেঁড়ার মধ্যেও এই পাওয়ার স্ট্রাগলের ছাপ স্পষ্ট। মনে রাখতে হবে, এক হাতে ছবিটা ছেঁড়া সহজ নয়। ছেঁড়া টুকরোগুলোকে দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিল।

তারপর কী হল? বিশ্বজিৎদা অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে।

আমার কাছে খবর পেয়ে পরদিন পুলিশ আসে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওই ছবিটা পায়। শুধু তাই নয়, আগেও বহুবার লুসি ওরকম ছবি এঁকেছেন। সেসব ছবির ছেঁড়া টুকরোও পুলিশ খুঁজে পায়। আর্টিস্ট হিসেবে বাঁ-হাতই উনি ব্যবহার করতেন। তাই মূলত ছবিতেই সে প্রতিফলন ছিল। যতবার বাঁ-হাত সে ছবি এঁকেছে, ডানহাত সময়মতো ছিঁড়ে ফেলেছে। লুকিয়ে রেখেছে। পুলিশের জেরার মুখে প্রথমদিকে লুসি নানা রকম বিভ্রান্তিকর তথ্য দিলেও পরে অপরাধ স্বীকার করে নেয়। এসব কথা জিওভানির কাছে পরে শুনেছিলাম। ততদিনে দেশে ফিরে এসেছি।

পুলিশ লুসিকে অ্যারেস্ট করে। ফ্রান্সিসকোর মৃতদেহ অবশ্য পাওয়া যায়নি। ফুলগাছের তলা থেকেই নিশ্চয়ই ওটা পরে অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেউ তো আর বাড়ির উঠোনে চিরকাল নিজের স্বামীর ডেডবডি রেখে দেওয়ার ঝুঁকি নেবে না। স্বাভাবিক। কিন্তু কোথায় ডেডবডিটা লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল, সে কথা লুসি হাজার জেরাতেও বলেননি।

কিন্তু কারণটা কী ছিল?

না, সেটা আর জানা হয়নি। আমি তো তার কয়েকদিনের মধ্যে ফিরে আসি। তখন ইনভেস্টিগেশন তো সবে শুরু হয়েছিল। তবে যেটা সন্দেহ করা হচ্ছিল তা হল, লুসির এই অসুস্থতার কথা ফ্রান্সিসকো জানতে পেরেছিলেন আর তাই চিকিৎসার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। লুসি নিশ্চয়ই তা চাননি। কারণ, দুটো হাতই হয়তো চায়নি যে তাদের স্বাধীনতা এত সহজে চলে যাক। তা এসব অনেক সম্ভাবনাই কফির কাপ সামনে থাকলে আপনাআপনি আলোচনায় চলে আসে। সত্যটা কী, তা আমি কয়েকদিন

আগে পর্যন্ত জানতে পারিনি।

লেট মি গেস, বিশ্বজিৎদা বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠল, এসবের মূলে থাকে মূলত টাকা। খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে ফ্রান্সিসকো মারা গেলে লুসির অর্থের দিক দিয়ে বড় রকম কোনও লাভ হত। বিমা জাতীয় কিছু। ঠিক কিনা?

অনিলিখা মুচকি হেসে বলে উঠল, আগে খুনটাকে তো হতে দাও। যেখানে খুনই হয়নি, সেখানে সে রহস্যের সমাধান করবে কী করে? দিনকুড়ি আগে ইতালি থেকে একটা ফোন পাই। আমার নম্বর ওখানকার পুলিশের কাছে ছিল। ওরা জানায় যে, লুসিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, ফ্রান্সিসকোর মৃতদেহ এতদিন বাদে সুইস আল্পসেই পাওয়া গিয়েছে। বরফের অনেক তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি ওখানে আর-একটা দুর্ঘটনা ঘটে। হারিয়ে যাওয়া গ্রুপের খোঁজ করতে গিয়ে ফ্রান্সিসকোর বডিও পাওয়া যায়। ডিএনএ টেস্টও কনফার্ম করেছে যে, ওটা ফ্রান্সিসকোরই।

মানে? তার মানে এই মৃত্যুতে লুসির আদৌ কোনও হাত ছিল না? তা হলে এসব ছবির অর্থ?

সব রহস্যের কি সমাধান হয়? হয়তো লুসির বাঁ-হাত শুধু ডানহাতকে একটু বিপদে ফেলতে চাইছিল। শেষমেশ ডানহাতের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও বলতে পারো। কতদিন আর ডানহাতের শাসন মেনে চলবে? ওই ছবি আঁকাই ছিল বাঁ-হাতের একমাত্র ভাষা। আর কনফার্মড না হলেও অনেকের সন্দেহ ওইসব গাছ, বাগানের যত্ন নিত লুসির ডানহাত। তাই গাছেদের উপরেও একইসঙ্গে প্রতিশোধ। বলাবাহুল্য পুলিশি তল্লাশিতে একটা গাছও আর টিকতে পারেনি। কী অদ্ভুত ধরনের রোগ ভাবা যায়?

তা লুসি এখন কোথায়?

যেখানে বহুদিন আগেই থাকার কথা ছিল। জেনোয়ায় মানসিক রোগীদের হাসপাতলে।

অনিলিখা উঠে দাঁড়াল, যাই, বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে। দেখি, দরকারি কাজগুলো সারতে পারি কিনা!



কে ছিল সে

আমার ছোটবেলা যেন একটা হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট স্বপ্নের মতো। ফিরে তাকালে কিছুই খুঁজে পাই না। আসলে, বড় হয়েছি একটা অনাথ আশ্রমে। সেখানে প্রত্যেকটা দিন যেন ঘুরেফিরে সেই একইভাবে ফিরে আসত। নতুনত্ব কিছুই ছিল না। সেখানে আমাদের দেখাশোনা যাঁরা করতেন তারা যে ভালোবাসতেন না, তা নয়। কিন্তু তা যেন দুপুর আর রাতের খাবারের মতো নিয়মে বাঁধা। পরিমিত। সবার ভাগে একইরকম জোটে। বাড়তি কিছু পাব তার আশা ছিল না। বছরে একবার আশ্রমে অনুষ্ঠান হত। সে অনুষ্ঠানে বাইরের অনেক লোক আসতেন। তখন আমার বয়সি কাউকে তাদের বাবা মায়ের পাশে দেখলে প্রচণ্ড হিংসে হত। মনে হত, গিয়ে বলি—আমিও ভালো আছি, আমিও কবিতা বলতে পারি, আমিও গান গাইতে পারি। তবু আমার পাশে কেউ নেই কেন?

শুধু আমি কেন—আমরা সবাই মেতে উঠতাম ওই একদিনের অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রতিযোগিতায়—সামান্য প্রশংসার খোঁজে। কেন, তা ভাবলে আজ সত্যিই হাসি পায়। হয়তো অজানা এক অভাববোধ থেকেই এ প্রবণতা হত।

পড়াশুনোয় মোটামুটি ভালোই ছিলাম। এখানে আমাদের শিক্ষকদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। তাঁদের উৎসাহে আমার জেদ আরো বাড়ল। আরও ভালো করতে হবে। মাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করে ফেললাম। উচ্চমাধ্যমিকের পর একটা ভালো সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সুযোগ পেলাম। সরকারি বৃত্তি পাচ্ছিলাম। তা ছাড়া এক সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে আসায় হোস্টেলে থাকার খরচও দিতে হয়নি। তাই পড়াশুনো চালিয়ে যেতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরে চাকরিও পেয়ে গেলাম। প্রথমেই একটা বড় আই. টি. কোম্পানিতে। হঠাৎ করে নিজের একটুকরো পৃথিবী খুঁজে পেলাম। অনেক স্বাধীনতা। যেন অনেকদিন ঘরবন্দি থাকার পরে খোলা আকাশের নীচে। তারপর দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে গেছে। আজ প্রায় ভুলেই গেছি শৈশবের সেই ঝাপসা দিনগুলোকে। যে স্মৃতি আঁকড়ে থাকার মধ্যেই কোনও আনন্দ ছিল না—হয়তো তাই।

কিন্তু, সেদিন ফের মনে পড়ে গেল হঠাৎ করে। যে ঘটনার ব্যাখ্যা আমি আজও খুঁজে পাইনি। সেটাই বলি।

মাস ছয়েক আগে অফিসের ট্যুরে আমাকে দুর্গাপুরে যেতে হয়েছিল। ওখানে গান্ধিমোড়ে এক মাঝারি মানের হোটেলে গিয়ে উঠেছিলাম। সকালের ট্রেনে পৌঁছে চেক-ইন করে লাগেজটা কোনোরকমে রুমে রেখে বেরিয়ে পড়লাম অফিসের কাজে।

ফিরতে ফিরতে ছ'টা-সওয়া ছ'টা হয়ে গেল। শীতের সন্ধ্যা। দুর্গাপুরে এর মধ্যেই বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে। লোক চলাচলও বেশ কমে এসেছে রাস্তায়। সকালে তাড়াহুড়োতে হোটেলটা ভালোভাবে দেখার সুযোগ পাইনি। সন্ধের আবছা আলোতে দেখলাম। দারুণ সুন্দর জায়গায় হোটেলটা। চারধারে ঝাউ আর শাল গাছ। সামনের বিস্তৃত লনে নানান

ধরনের ফুলের গাছ। বাতাসে শিউলির মিষ্টি গন্ধ। কাচের দরজা পেরোলেই বড় রিসেপশন। বড়ো হলঘরে সোফাসেট দিয়ে সাজান।

রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে লিফটে উঠে এলাম। ফোর্থ ফ্লোর। লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে ডানদিকে প্যাসেজের শেষ প্রান্তে ঘরটা। ঘরে ঢুকে স্নান সেরে টিভির সামনে গেলাম। এত ক্লান্ত যে অন্য কোনও কাজ আর করার অবস্থায় নেই।

টিভিতে এটা-ওটা দেখে খানিকটা সময় কাটানোর পরে ন'টা নাগাদ ডিনার পর্ব শেষ করে শুয়ে পড়লাম। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম কে জানে! একটা খস্‌খস্‌ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বিছানার পাশেই বেডসাইড ল্যাম্পের স্যুইচ। সেটা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়ল বেডসাইড টেবিলে। চমকে উঠলাম। একটা স্টিল ফ্রেমে এক ভদ্রমহিলার সাদা-কালো ছবি। বয়স চল্লিশ মতো হবে। চওড়া পাড় শাড়ি, মাথায় ঘোমটা। কপালে বড় সিঁদুরের টিপ।

ছবিটা কার? মহিলাকে আগে কখনো দেখেছি কি? ছবিটা এখানে এলই বা কী করে? শোওয়ার সময়ে তো এটা এখানে ছিল না! তাহলে নির্ঘাৎ চোখে পড়ত। মহিলা যে গ্রামের, তা তার ঘোমটার ধরণ দেখেই বোঝা যায়। লজ্জা আর আগ্রহের এক অদ্ভুত মিশ্রণ চোখের দৃষ্টিতে। আর সে চোখের দৃষ্টি যেন কত চেনা! যেন স্বপ্নে দেখা।

ছবির ফ্রেমটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ দেখলাম। ভদ্রমহিলার বয়স খুব বেশি না হলেও ছবির ওপরে যেরকম লালচে দাগ পড়েছে, তাতে ছবিটা কিন্তু কমবয়সি বলে মনে হয় না।

দারুণ রহস্য। ছবিটা কী করে এখানে এল—হাজার ভেবেও তার কোনও উত্তর খুঁজে পেলাম না। চোখে তখন ঘুমের ঘোর। এত রাতে করারও কিছু নেই। কোনোরকমে ছবিটা পাশের টেবিলের উপর রেখে ফের ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে আটটায়। সুতরাং, ন'টায় বেরোতে হলে মাঝের সময়টায় কীরকম তাড়াহুড়ো করতে হয় তা না বললেও চলে।

মনের শার্লক হোম্‌সকে বোঝালাম যে ফিরে এসে রহস্য উদ্ধার করা যাবে।

প্ল্যান্ট থেকে ফিরলাম সন্ধে সাতটা নাগাদ। শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি। ছবির কথা তখন বেমালুম ভুলে গেছি। খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে বাইরের দিকে চোখ পড়ল। জানলার বাইরে মুখভার করা কালো মেঘে ঢাকা আকাশ। যে-কোনও সময়ে জোর বৃষ্টি আসবে। হলও তাই। মিনিট দশের মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হল। সঙ্গে তেমনই ঝড়। শালগাছগুলো বিদ্যুতের আলোয় চমকে চমকে উঠছে। ঝড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃষ্টির ছাঁট হঠাৎ হঠাৎ করে জানলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এসব দেখতে দেখতে কখন যে সোফাতে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কে জানে? স্বপ্ন দেখছিলাম যে আমি গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছি। কী একটা পুজো হচ্ছে। পঞ্চপ্রদীপে রাখা হাত কে যেন আমার মাথায় ঠেকাচ্ছে। তার মুখ ঘোমটায় ঢাকা।

ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরও সে স্বপ্নের ঘোর কাটতে খানিকক্ষণ কেটে গেল। বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ থেমেছে। কিন্তু চোখের সামনের অন্ধকারটা তো কাটছে না। ঘরের আলোটা নেভাল কে? আমি? না, তাই বা কী করে হয়? আমি তো কাগজ পড়ছিলাম। হঠাৎ গতকালের ছবিটার কথা খেয়াল হল। আশ্চর্য! ওটা তো টেবিলের উপরে নেই!

ঘরের আলোটা জ্বেলে ডিটেকটিভের দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বোলালাম। বাইরের দরজাটা ভেজানো। ওটা তো বন্ধ করেছিলাম বলেই মনে হয়। স্বাভাবিকভাবেই এরপরে যেটার কথা সবার আগে মনে হয়—সেটাই দেখলাম। মানিব্যাগ। টেবিলের ড্রয়ারে যেরকম ছিল—সেরকমই আছে। টাকা-কার্ড সব ঠিকঠাক আছে। নিশ্চিত হয়ে দরজা লক করে সোফার দিকে এগোতেই চোখ পড়ল চাদরটার উপর। লালমতো কী একটা কাপড় বিছানার একপ্রান্তে চাদরের তলা থেকে বেরিয়ে আছে। সাবধানে চাদরটা সরাতেই যা বেরোল, তাতে চোখে যেটুকু ঘুমের ঘোর ছিল তা নিমেষে উধাও।

একটা রংচটা ছোট লাল জামা। দু'তিন বছরের বাচ্চা ছেলের তবে

অনেক পুরোনো। এরকম জামা আমার খাটের উপরে রাখল কে? কেনই বা রাখল?

সে রাতটা প্রায় না ঘুমিয়েই কাটল। ভোর হতেই নীচে নেমে রিসেপশনে জামাটা দিয়ে এলাম। মাথা এমনিতেই গরম ছিল। এটা কী ধরনের হোটেল যে প্রতিরাতেই কেউ না কেউ এসে ঘরে কিছু রেখে যায়—কখনও ভূতুড়ে ছবি—কখনও বা লাল শার্ট। বিস্তর চেঁচামেচির পর মাথা একটু ঠান্ডা হতে, লিফটে উঠতে যাব, হঠাৎ অফিসের ভট্‌চায্যিদার সঙ্গে দেখা। উনি যে এখানে এসেছেন তা জানতাম না। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ওনার মুখের হাসিটা একটু বেড়েছে। বাড়বেই তো।

সেদিন অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। ভট্‌চায্যিদাও ইতিমধ্যে হোটেলে ফিরে এসেছেন। উনি আছেন আমার ডানদিকের দুটো ঘর বাদ দিয়ে। খানিকবাদে আমিই ওনার ঘরে গিয়ে হানা দিলাম। সন্ধেটা গল্পগুজব করে ভালোই কাটল। ইচ্ছে করেই গত দু'রাতের অভিজ্ঞতার কথা ওনাকে বললাম না। মজাটা যে উনিই করেছেন, এ ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই। মজা করার জন্য অফিসেও মাঝেমধ্যে এ ধরনের আজব আজব কাণ্ড ঘটান উনি। একসঙ্গে ডিনার খেয়ে ঘরে যখন ফিরলাম, রাত তখন দশটা।

ঘরে ঢুকেই চোখ পড়ল খাটের উপর। ধবধবে সাদা চাদরের উপরে খয়েরি রঙের রংচটা একটা ছোট খেলনা ভালুক। ছেঁড়া পা-টা সেলাই করে জোড়া হয়েছে। অবাক কাণ্ড! ভট্‌চায্যিদা তো আমার সঙ্গেই ছিলেন। ওঁর পক্ষে তো এটা করা সম্ভব ছিল না। দরজাও লক করা ছিল। আর কেউ ঢুকবেই বা কী করে? যাই হোক। অনেক রাত হয়েছে। তাই নিরীহ ভালুকটাকে রাতের জন্য ঘরেই আশ্রয় দেব ঠিক করলাম। তবে ঠিক করলাম যথেষ্ট হয়েছে আজ রাতে আর কোনোভাবেই ঘুমাব না। এক কাপ কফি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমের ভান করে সতর্কভাবে পড়ে রইলাম। মন বলছে আজ রাতে কিছু একটা ঘটবে। আজ ফের কী উপহার পাই কে জানে? তবে যে-ই এসব জিনিস পাঠাক না কেন তার

নিশ্চিত কোনও উদ্দেশ্য আছে।

পাশের টেবিলে ডিজিটাল ঘড়ি। মাঝে মধ্যেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখছি। এগারোটা-বারোটা-একটা রাত হামাগুড়ি দিয়ে বেড়েই চলেছে। বাইরে যাও বা দু'একটা গাড়ির হর্নের শব্দ পাচ্ছিলাম, তাও এখন নেই। তার বদলে মাঝে মধ্যে ঝিঁঝির তীব্র তান শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকা যায়। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ পেলাম। টের পেলাম দরজা খুলে যাচ্ছে। একটা ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা ঘরে এসে ঢুকল। একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে শুয়ে আছি। চোর? না, টেবিলের ওপরে মানিব্যাগ রাখা, সেদিকে ছায়ামূর্তি এগোল না। আস্তে আস্তে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। ভট্‌চায্যিদা? নাহ্। মনে হচ্ছে শাড়ি-পরা কোনও মহিলা। ভয়ে-আতঙ্কে হাত-পা অবশ হয়ে গেছে। ডানদিকে একটু দূরে আলোর সুইচ। কিন্তু আলো জ্বালার সাহস হল না। ছায়ামূর্তি ঠিক আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। পরক্ষণেই অনুভব করলাম কে যেন আমার মাথায় হাত রেখেছে। চুলের ওপর এক শীতল স্পর্শ। মিনিট দুয়েক।

হাতটা সরে যাওয়ার মিনিট তিনেক পরে বুঝলাম বাইরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বাকি রাতটা ছিলাম সকালের অপেক্ষায়। মনে হচ্ছিল দেওয়ালে চাঁদের আলোয় গড়া নকশাগুলো যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কার স্পর্শে ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আধখোলা চোখের সামনে আলোছায়ায় কার যেন অবাধ বিচরণ।

একসময় ভোর হল। জীবনে প্রথমবার পাঁচটায় স্বেচ্ছায় বিছানা ছাড়লাম। সোজা রিসেপশনে। ছেঁড়া পুরোনো ভালুকটা দেখিয়ে দারুণ চেঁচামেচি করার পর রাতের ঘটনাটাও বললাম। ওরা অবাক হয়ে শুনছিল। হয়তো আমাকেই উন্মাদ ভাবছিল। কখনো বাচ্চাছেলের লাল শার্ট নিয়ে আসি, কখনো বা ভালুক নিয়ে আসি।

এর মধ্যে ভট্‌চায্যিদাও এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। ওনার ঘরে কে একজন ইংরেজিতে লেখা হুঁশিয়ারি চিরকুট রেখে গেছে। এখানে অবশ্য জানিয়ে রাখি, ওটা আমারই কীর্তি। কাল গল্প করতে গিয়ে রেখে এসেছিলাম অ্যাশট্রের নীচে। কিন্তু আসল রহস্য তো আমার ঘটনা। কে এসেছিল অত রাতে? সেটার কোনও হদিশ পেলাম না। সেদিন ওদের সঙ্গে কথা বলে, চেক আউট করে হোটেল থেকে বেরোনোর সময় ঠিক করেছিলাম—এই শেষ। এই হোটেলে আর কখনো পা রাখব না।

কিন্তু এমনই ভাগ্য যে মাসখানেকের মধ্যেই আবার উঠতে হল সেই এক হোটেলে।

চেক ইন করার সময় মহিলা রিসেপশনিস্টটি খুব লজ্জার সঙ্গে আগেরবারের ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইল। তারপরে বলতে শুরু করল—আপনি চলে যাওয়ার পরে আমরা ওই ঘটনার ফুল এনকোয়ারি করি। কিছুদিন পরে জানতে পারি যে ওই ভালুকটা আর লাল শার্টটা আমাদের এখানকার এক বৃদ্ধা কর্মচারীর কাছে ছিল। এখানকার হাউস কিপিং স্টাফ। এ দুটো ওর ঘরেই রাখা থাকত। ওর তিন বছরের ছেলে বহু বছর আগে মেলায় হারিয়ে যায়। তারপর থেকেই মাথায় সামান্য গোলমাল দেখা দেয়। আপনি যে জিনিসগুলো পেয়েছিলেন, সবই ছিল ওর ওই হারিয়ে যাওয়া ছেলের।

—ও বুঝেছি। দ্যাট এক্সপ্লেনস্‌। আমাকে দেখার পর ওর মনে হয় যে আমিই ওর ছেলে, তাই তো?

একটু থেমে ফের বললাম—আর তাই আমাকে মনে করানোর জন্য ওর ছেলের ব্যবহার করা জিনিসগুলো বা ওর কম বয়সের ছবি আমার ঘরে রেখে এসেছিল। নির্ঘাত ডুপ্লিকেট চাবি ছিল ওর কাছে। এখানকারই স্টাফ। তাই দরজা খুলতেও অসুবিধে হয়নি। আচ্ছা, ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি?

রিসেপশনিস্ট চুপ করে থাকল।

আমি ফের বলে উঠি,—না, না আমি বকাবকি করব না। এমনিই দেখা করতে আগ্রহ হল তাই।

না—মানে...—রিসেপশনিস্ট কিন্তু কিন্তু করতে থাকে।

—আপনারা আবার কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি তো ওর বিরুদ্ধে? দ্যাটস নট রাইট। ইউ সুড্ হ্যাভ্ কনসাল্টেড মি! উত্তেজিত হয়ে বলে উঠি।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটির পাশে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল, সে-ই এবার এগিয়ে এসে বলে উঠল—

—আসলে আমরাই বুঝতে পারছি না এটা কী করে হল! ওই মহিলা মানে বিনতিদি আপনার গতমাসে এখানে আসার প্রায় দু'মাস আগে দু'দিনের জ্বরে মারা যান। এই হোটেলেই। পুরো ব্যাপারটাই...

কথাটা শুনে চমকে উঠলেও ভয় পাইনি। কথা না বাড়িয়ে রুমে চলে গিয়েছিলাম। নিজের অজান্তেই ছলছল করে উঠেছিল চোখ দুটো। কপালের উপর সেই শীতল স্পর্শেও যে উষ্ণতা ছিল তা ওদের বোঝাব কী করে?

সেবারে আমার আগেরবারের মতো কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি, যদিও প্রতিরাতে অপেক্ষা করেছি সেই ছায়ামূর্তির জন্যে। কেউ আসেনি, কোনও উপহারও পাইনি। তারপর আরও কয়েকমাস কেটে গেছে, তবু মনের মধ্যে আজও একটা প্রশ্ন উঁকি মারে। ওই মহিলার ওই ছবিটা আমার এত চেনা লেগেছিল কেন?



মিঃ পাই-এর এক্সপেরিমেন্ট

না, না, অবাক হওয়ার কিছুই নেই। মাইক যাতে রাত এগারোটার পর আর না বাজতে পারে, সে ব্যবস্থা তো আমিই নিয়েছিলাম।

—মানে?

—কিছুই নয়, ওটা আমার একটা ছোট্ট আবিষ্কার। অডিয়ো ক্যাপ যন্ত্র। অন করলে এক মাইল রেডিয়াসে আর কেউ ৪০ ডেসিবেলের বেশি আওয়াজ করতে পারবে না। কাল রাতে বাইরে অমন চিৎকার হচ্ছিল দেখে চালিয়ে দিয়েছিলাম। ব্যস, মাইক বন্ধ।

অবাক হয়ে শুনছিলাম। ভদ্রলোক বলেন কী! যেটা নিয়ে কালকে অর্থাৎ দুর্গাপুজোর সপ্তমীর রাতে দু-দলের মধ্যে বেজায় মারামারি হয়ে গেল—মাইকের দোকানে ভাঙচুর হল—যার জন্য কলকাতা থেকে আসা গানের দল ফিরে গেল—সেটা নিয়ে—বদ্ধ উন্মাদ না হলে কেউ এত

সহজে একথা বলতে পারে? আর এরকম কি সত্যিই সম্ভব?

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যার সম্বন্ধে এ কথা বলছি তার নাম মিঃ পাই। পরে জেনেছিলাম আসল নাম সমুদ্র বসু। আমার গত দশ বছরের প্রতিবেশী। যদিও গত দশ বছরে দশ বারও দেখা হয়নি। আর যতবারই দেখা হয়েছে ভদ্রলোক একবারও আমার দিকে না তাকিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেছেন।

কল্যাণগড়ে আমার বাড়ির ঠিক পাশেই এনার বাড়ি। প্রায় দশ একরের উপর উঁচু পাঁচিল ঘেরা জায়গা। বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। বাড়ি থেকে বছর তিরিশের এক সুসজ্জিত যুবক মাঝেমধ্যে বেরোয়। জিগ্যেস করে জেনেছি তার নাম গণেশ। মিঃ পাই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট। কিন্তু কীসের অ্যাসিস্যান্ট—মিঃ পাই কী করেন তা নিয়ে যা জিগ্যেস করেছি—তার খুব সহজ উত্তর কখনো পাইনি। এটুকু শুধু জেনেছি যে মিঃ পাই হলেন সায়েন্টিস্ট। কিন্তু একটা মফসসল শহরে বসে—একা একা কী নিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা করতে পারেন তা বোধগম্য হয়নি। আমাদের কল্যাণগড়ে বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তা হল দু-একটা টিভি-ফ্রিজ-রেডিয়ো সারাই-এর দোকান আর বোমা তৈরি।

মিঃ পাইকে কখনোই প্রায় বাড়ির বাইরে দেখা যায় না। লোকমুখে শোনা গেছে ভোর চারটে নাগাদ না কি মাঝেমধ্যে হাঁটতে বেরোন। সঙ্গে ওই গণেশও থাকে। আবার সাড়ে চারটে নাগাদ, সূর্য ওঠার অনেক আগে নাকি বাড়িতে ঢুকে আসেন। অবশ্য এ কথাটা যাদের মুখে শোনা গেছে—বলা বাহুল্য তারা নিজেরাও খুব স্বাভাবিক লোক নয়। তার মধ্যে জগাপাগলাও পড়ে। ও টের পেয়েছিল তার কারণ এক শীতের ভোরে মিঃ পাই ওর গায়ের উপর একটা দামি কম্বল ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন।

আমিও এ ধরনের লোকের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে আলাপ করার সাহস পাইনি। কে জানে কী ধরনের উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব। চারদিকে নানান ধরনের সন্ত্রাসমূলক কাজ হচ্ছে। কৌতূহল দেখিয়ে বিপদে পড়ার

কোনও মানে হয়! আর মিঃ পাইকে দেখে এমনিতেও খুব স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয় না। কীরকম বড় বড় চোখ, গোল কাচের চশমা দিয়ে ঢাকা। কাঁধ অবধি কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া চুল। সব সময় ব্যস্ততা। মুখে সর্বদা একগাল হাসি। এই এখনকার দিনে কেউ সারাক্ষণ হেসে যেতে পারে!

তা যা বলছিলাম। এটাই বলতে গেলে মিঃ পাই-এর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। দশবছর বাদে। তবে এবারেও দেখাটা খুব স্বাভাবিক ভাবে হয়নি।

অষ্টমির দিন সকালে উঠে দেখি কুচো উধাও। কুচো হল আমাদের বাড়ির পোষা ল্যাব্রাডর। মাস ছয়েক বয়স। ভারী দুষ্টু। চেনা অচেনা যে-ই হোক না কেন, গাল চেটে দেবে। লাফিয়ে কোলে উঠে পড়বে। বলাবাহুল্য আমার বাড়িতে আসে এমন অনেকেই সেটা পছন্দ করে না। চেন দিয়ে বেঁধে রাখারও উপায় নেই। কুঁই-কুঁই কান্নার শব্দে আমাদের বিরক্ত করে তোলে।

তাই ওকে খোলাই রাখা হয়। কেউ আসার কথা থাকলে আগে থেকে চেন দিয়ে বাঁধা হয়। তা, এরকম একটা প্রাণবন্ত কুকুর হঠাৎ করে সকাল সকাল উধাও হয়ে যাবে, আর উধাও হয়ে যাওয়ার পরে কেউ নালিশ করতে আসবে না এটা খুবই অস্বাভাবিক।

সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজছি, হঠাৎ বাইরের দরজায় ধাক্কা। খুলে ভূত দেখার মতো দেখি দরজার সামনে গণেশ। যথারীতি সুসজ্জিত। কালো প্যান্ট, লাল-সাদা ডোরাকাটা শৌখিন শার্ট। তার উপরে ব্লেজার। ব্লেজারটা দেখেই চিনলাম, গতবছরে পাড়ার নাটক মাইকেল মধুসূদন-এ ব্লেজারটা চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল।

কোনওরকম সহবৎ না দেখিয়ে বেশ জমিদারি লেঠেলদের কায়দায় গণেশ বলে উঠল—স্যার আপনার খোঁজ করছিলেন। এক্ষুনি যেতে হবে।

—কী ব্যাপার?

ওকালতি করি, সে ব্যাপারে কোনও পরামর্শ? একদম শাঁসালো মক্কেল হাতছাড়া করা একেবারেই উচিত নয়—তবু কুচোর কথা খেয়াল করে

বলে উঠলাম—

—আমার কুকুরটাকে সকাল থেকে পাচ্ছি না। ওটার একটু হদিশ করে আসছি।

গণেশ নির্বিকার ভাবে বলে উঠলেন—কুকুরটা স্যারের কাছেই আছে। ও ব্যাপারেই ডাকছেন।

—সে কী! কাউকে কামড়ে-টামড়ে দিয়েছে না কি? সর্বনাশ, ও তো সেরকম নয়।

বলে মনে মনে ভাবলাম, আর কাউকে না কামড়ালেও মিঃ পাইকে কামড়ানোর অনেক কারণ থাকতে পারে।

গণেশ বলে উঠল—না, না। সেরকম কিছু না। আমিই সকালবেলা এখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম। স্যার বলেছিলেন।

—মানে? ঘরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ছিল। তার উপরে একটা হালকা শাল জড়িয়ে গণেশের পিছু নিলাম। গণেশের দশ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা স্পিডের হাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাশের বাড়ির গেট পেরিয়ে ওর সঙ্গে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। বাগান পেরিয়ে বাড়িতে ঢোকার পরই সামনে বিশাল ড্রয়িংরুম। বই বোঝাই সার সার আলমারি। ঘরে দামি সোফাসেট।

—আপনি এই সোফাতে বসুন, আমি কুচোকে নিয়ে আসছি।

—মিনিট দুয়েকের মধ্যে কুচো ঘরে ঢুকল। সঙ্গে গণেশ। আর একটা বিচ্ছিরি কুচকুচে কালো বেড়াল। চোখ দুটো একদম হলুদ। কুচো আমার কোলে উঠে পড়ে একবার আমার গালটা চেটে আবার নেমে গিয়ে বেড়ালটার পাশে গা লাগিয়ে মেঝেতে বসল। অদ্ভুত কাণ্ড! বেড়াল দেখলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে, আর হঠাৎ এর সঙ্গে এরকম আদিখ্যেতা! আমার ডাকে কোনও সাড়া না দিয়ে নখ দিয়ে বেড়ালটার পিঠ চুলকোতে শুরু করল।

অবাক হয়ে কুচোর কাণ্ড দেখছি—তার মধ্যে মিঃ পাই ঘরে ঢুকলেন। সাদা পাজামার উপর ভারতীয় জাতীয় পতাকার রঙের পাঞ্জাবি। এসেই আমার উলটোদিকের সোফায় বসে প্রথমেই যে কথাটা বললেন তা হল এই—

—ক'দিন ধরে দেখেই মনে হয়েছিল আপনার থেকে আপনার কুকুরটা অনেক বেশি ইনটেলিজেন্ট। তাই এক্সপেরিমেন্টের জন্য সকাল সকাল ধরে আনলাম। আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়নি। কুকুরটা সত্যিই অসাধারণ। আমার ক্যাট ল্যাঙ্গোয়েজ ট্রান্সলেটর ব্যবহার করে ঠিক দু-ঘণ্টার মধ্যে বেড়ালের ভাষা দিব্যি তুলে নিয়েছে। ওই, ওই যে কুকুরটার কানের মধ্যে কালো ছোট সুইচের মতো জিনিসটা দেখছেন না, ওটাই হল ট্রান্সলেটার। বেড়ালটার মুখের কাছেও আছে। তবে কালো রঙের জন্য দেখা যাচ্ছে না। কী সুন্দর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে দেখছেন! আর তাই তো দু-ঘণ্টার মধ্যে এত বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ভাবুন তো—বাড়ির কুকুর-বেড়ালের মধ্যে যদি সম্পর্ক ভালো করা যায়, কত বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম—আপনি ভেবেছেনটা কী! আমাকে না জানিয়ে আমার বাড়ি থেকে আমার কুকুর ধরে এনেছেন—তার ওপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন! ওর যদি কিছু হয়! আপনাকে জেলে পাঠাতে পারি—জানেন?

মিঃ পাই বেশ অমায়িকভাবে হেসে বলে উঠলেন—তবে এখন থেকে কুচো কিন্তু আপনার কথার থেকে আমার কথাই বেশি শুনবে। আর আপনি না চাইলেও এখানে চলে আসবে।

তারপর গণেশের দিকে তাকিয়ে বললেন—কী হল? ওনার জন্যে চিংড়ির কাটলেটটা এখনও এল না?

গণেশ কিছু বলার আগেই সুসজ্জিত বাবুর্চি ট্রে-তে করে একটা ভারী সুন্দর প্লেটে দুটো বিশাল চিংড়ির কাটলেট আর চা নিয়ে ঢুকল।

বেশ অবাক হলাম। সত্যি বলতে কী, চিংড়ির কাটলেট আমার ফেভারিট। কিন্তু উনি তা জানলেন কী করে!

ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটানোর আগেই মিঃ পাই বলে উঠলেন—কলকাতার মিত্র কাফে থেকে সন্ধেবেলা আপনার জন্য আনিয়েছি। আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কাল দুপুরে এই নিয়ে কথা বলছিলেন, তাই তো?

—হ্যাঁ মানে—কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?

—ওই আপনার জানলার ওপরে লেসার ফেলে কুকুরটার কথা বোঝার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তা কি আর শোনার উপায় আছে? আপনি আর আপনার স্ত্রী যা চিল চিৎকার করছিলেন! আমি তো স্পষ্ট শুনতে পেলাম আপনি বাড়িতে চিংড়ির কাটলেট বানাতে বলছেন আর আপনার স্ত্রী কিছুতেই তা করবেন না। ঠিক কি না? সত্যি বলতে কী এত ছোট ব্যাপার নিয়ে আপনার এতটা রাগারাগি করাটা মোটেও ঠিক নয়।

—আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক মশাই। জানেন আমি আপনার বিরুদ্ধে এজন্য আইনি ব্যবস্থা নিতে পারি। এটা কী ধরনের ভদ্রতা!

মিঃ পাই কথাটা প্রায় উড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন—না, না। এসব কথা নিয়ে একদম মাথা গরম করবেন না। এবার খেতে শুরু করুন। ঠান্ডা হয়ে গেলে ভালো লাগবে না।

চিংড়ির কাটলেটে কামড় বসানোর পরপরই মাথাটা বেশ ঠান্ডা হয়ে গেল। মিঃ পাই কুচোর এরকম ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক কারণগুলো বোঝাতে শুরু করলেন।

আর কথায় কথায় গতরাতে মাইক থামানোর কথাটা উঠতে বেশ সপ্রতিভভাবে তার কারণটাও বোঝালেন।

আধঘণ্টা বাদে কুচোকে নিয়ে বিদায় নিলাম। এটাই হল আমাদের প্রথম আলাপ। এটুকু বুঝলাম—আমার প্রতিবেশী ভালো না খারাপ সেটা জানি না, তবে পাগলাটে ও খুব ইন্টারেস্টিং মানুষ এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রথম আলাপের পর থেকেই খুব ইচ্ছে ছিল আবার মিঃ পাই-এর বাড়ি যাব। কিন্তু না বলে কয়ে তো আর যাওয়া যায় না। যদিও কুচোর মধ্যে সেই বোধ একেবারেই নেই। বেশ টের পাই মাঝেমধ্যেই পালিয়ে ও বাড়ি চলে যায়। শেষে কুচোকে সঙ্গে নিয়েই একদিন হাজির হলাম মিঃ পাই-এর বাড়ি। শনিবার সকালের দিকে। গেটের সামনে মনে হয় ক্যামেরা আছে। সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র গেট খুলে গেল। ঢোকার

পথে বড় বাগান। তার মধ্যে দিয়ে এক চিলতে ইট বাঁধানো পথ। সেটা পেরিয়ে বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। গণেশই খুলল। সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট, লাল টাই। একদম অফিসের পোশাক। এরকম মফস্বল শহরে এ ধরনের পোশাক পরে থাকতে কাউকে দেখিনি। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কুচো দুলাফে ভেতরে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

আমাকে নিয়ে গণেশ ড্রয়িংরুমে বসাল। আর তার পরেই মার্জিতভাবে বলে উঠল—আজকে কিন্তু স্যার খুব ব্যস্ত। দেখা করতে পারবেন না। কিছু বলার আছে?

আমি একটু বিব্রত হয়েই বলে উঠলাম—না, না সেরকম কিছু নয়। ভাবলাম, সেদিন আলাপ হল। আজকে একটু সময় আছে। দেখা করে আসি। কেমন আছেন উনি?

গণেশ কাঠকাঠ ভাবে বলে উঠল—ভালোই আছেন। আসলে স্যার গত একসপ্তাহ এত ব্যস্ত আছেন টেসলার এক্সপেরিমেন্টটা নিয়ে—ল্যাবেই দিনরাত পড়ে থাকেন।

—গণেশ, অবিনাশবাবু এসেছেন, বলিসনি তো!—বলতে বলতে মিঃ পাই হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন। আজ পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাকে। স্যুট-টাই।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—চলুন, ভালো সময়ে এসেছেন। ল্যাবে চলুন। আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাই।

ওনার এত তাড়া দেখে একটু অবাক হয়ে মিঃ পাই-এর পিছন পিছন এগিয়ে গেলাম। একটা ঘর থেকে আরেকটা ঘর। নানান ধরনের অজানা অচেনা যন্ত্র সাজিয়ে রাখা বেশিরভাগ ঘরে। বেশ ক'টা ঘর পেরোনোর পরে মিঃ পাই-এর পিছু পিছু একটা বড় ঘরে ঢুকলাম। ঘরের মাঝখানে একটা মানুষ-প্রমাণ লোহার খাঁচা। খাঁচাটার থেকে কয়েক ফুট দূরে দু-ধারে দুটো তারের জাল দাঁড় করানো।

—একটা মজা দেখবেন। ওই খাঁচার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান।

আমি অবাক হয়ে বললাম—আমি? ওই খাঁচার মধ্যে?

—হ্যাঁ, ঢুকুন। তারপরে বলছি।

মিঃ পাই-এর বলার মধ্যে কী ছিল জানি না, বোকার মতো খাঁচাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। খাঁচাটা হাইটে আমার থেকে ইঞ্চি দুয়েক বড়। তাই চুল লেগে যাচ্ছে।

একটু হাত-পা ছড়াব সেরকম জায়গাও নেই। কোনওরকম জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিঃ পাই খাঁচার দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন।

বললেন,— আপনি যেটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, ওটা হল ফ্যারাডের খাঁচা। অবশ্য তার উপর আমি বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছি। আর সেটাই আমার আবিষ্কার। বলে পাশের একটা সুইচ বোর্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—

—এই সুইচটা অন করলে খাঁচার দু-ধারে রাখা ওই কয়েলগুলো মিলিয়ন ভোল্টে চার্জ হয়ে উঠবে আর খাঁচার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক স্পার্ক চলে যাবে। একে বলে টেসলা এফেক্ট। জানেন তো? বাতাসে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির জন্য এটা হয়।

আমি চমকে উঠলাম।

—তার মানে? আমার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক স্পার্ক চলে যাবে?

মিঃ পাই আমার কথায় কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে সুইচের উপর হাত রেখে বললেন—

না, আপনার কিছু হবে না। আপনি যে খাঁচাটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, সেটা আপনার থেকে অনেক ভালো তড়িৎপরিবাহী। তাই খাঁচাটার মধ্যে দিয়ে যাবে। আপনি স্পার্ক দেখতে পাবেন, আপনার দিকে ছুটে আসবে।

খাঁচা থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতে যাচ্ছিলাম। মিঃ পাই বলে উঠলেন—খবরদার! বেরোবেন না। খাঁচার মধ্যে পুরো নিরাপদ। বেরোলেই মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন।

শুনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চুল, হাত, পা মাঝে মাঝেই খাঁচার গায়ে লাগছিল। বললাম—

—খাঁচার গায়ে তো হাত লেগে যাচ্ছে। কোনও অসুবিধে হবে না তো?

—খাঁচার কোনও অংশে হাত না দেওয়াই ভালো। কীসে যে কী হয়!

আর্তনাদ করে উঠলাম—কিন্তু হাত তো লেগে যাচ্ছে। কোনও উপায় নেই?

মিঃ পাই বললেন—এখন আর কিছু করা যাবে না। তা সঙ্গে মেটাল কিছু নেই তো?

—মানে? আমার সঙ্গে ঘড়ি, সেলফোন এসব তো রয়েছে!

মিঃ পাই চুক্‌চুক্ আওয়াজ করে ওনার লাল টাইটা ঠিক করতে করতে বলে উঠলেন—নাহ্, কাজটা ঠিক হল না, আগেই চেক করা উচিত ছিল। এ সব এক্সপেরিমেন্টে কখন যে কী হয়!

চেঁচিয়ে উঠলাম। কিন্তু ততক্ষণে বাতাসের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ বিচ্ছুরণ আমার দিকে ছুটে আসছে। তীব্র ঝলসানো আলো তারপর কী হয়েছিল জানি না।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি একটা খাটে শুয়ে আছি। পাশে মিঃ পাই দাঁড়িয়ে। আমাকে আশ্বস্ত করে বলে উঠলেন—

আরে, এত ভয় পেলে হবে? ভয়ে অজ্ঞানই হয়ে গেলেন! এ ধরনের এক্সপেরিমেন্টে মারা যাওয়ার ঘটনা খুবই কম। লং টার্ম মেমারি বাড়াতে এটা খুব সাহায্য করে। তাই তো এই যন্ত্রটা তৈরি করেছিলাম। ভালোই হল আপনার উপর পরীক্ষাটা হয়ে গেল। ঠিক সময়ে এসেছিলেন বলে।

কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলাম না। তবে এটা সত্যি—হঠাৎ করে স্কুলের দিনগুলো মনে পড়ে গেল। আর শুধু মনেই পড়ল না, বেশ ভালোরকম ডিটেলসও মনে পড়ল। যেমন ফিজিক্সের টিচার জীবনবাবুর যে প্রশ্নটা না পারার জন্য হাতে স্কেলের বাড়ি খেয়েছিলাম—সে প্রশ্নটাও।

মিঃ পাই পাশ থেকে বললেন—বাঙালি মানেই ভীতু। আহা, বলুন তো, মারা যাবার প্রোবাবিলিটি খুব বেশি হলে কি আপনাকে ওখানে ঢুকে দাঁড়াতে বলতাম? আর তাছাড়া বিজ্ঞানের স্বার্থে সামান্য আত্মত্যাগ করতেই হয়। গণেশটাও দিনকে দিন ভীতু হয়ে যাচ্ছে। ওকেই বলেছিলাম ভেতরে যেতে। আমার নিজের পক্ষে তো আর ওখানে ঢুকে কিছু করা সম্ভব নয়। নোটস নিতে হবে।

পাশ থেকে গণেশ কিন্তু কিন্তু করে বলে উঠল—স্যার আমার আর কোনও অসুবিধে ছিল না। কিন্তু লাস্টবার আমার মাথার চুলে আগুন ধরে গিয়েছিল কি না!

—দ্যাটস দ্য প্রবলেম। একটুকুতেই ভয় পেয়ে যাও। চুল থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী? এতবড় একটা এক্সপেরিমেন্ট!—মিঃ পাই ধমকে বলে উঠলেন।

হাত-পা অবশ লাগছিল। তবু তার মধ্যের মাথায় হাত দিলাম। নাহ্, চুল এখনও আছে।

গত কয়েক সপ্তাহে কানা হেবোর বাড়াবাড়িটা সত্যিই বেড়েছে। রাজনীতিতে দাদা হলে যেন চারটে হাত আর চারটে পা হঠাৎ করে গজিয়ে যায়। এমনিতেই সবাই হেবোকে ভয় পেত। এখন এ এলাকার ত্রাস। বোমা তৈরি করতে গিয়ে ওর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই থেকে নাম কানা হেবো। শুনলাম ছেলেদের হাইস্কুলের হেডস্যার বিপিনবাবুকে সবার সামনে চড় মেরেছে। সবজিওয়ালা সবজির দাম চাওয়ায় সেই গরিব লোকটাকে সবার সামনে জুতো পেটা করেছে। মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পথে একটা চাতালে বেশিরভাগ সময় দলবল নিয়ে বসে থাকে, টীকা-টিপ্পনী কাটে। কারো সাহসও নেই কোনওরকম প্রতিবাদ করার।

সেদিন দলবল নিয়ে আমার বাড়িতে চড়াও হল। কালীপুজোর চাঁদা। হাজার টাকা। আমি বিলটা দেখে একটু গাঁইগুঁই করতেই বলে উঠল—দু-হাজার হয়ে গেল। আরেকবার বললে চার হাজার করে দেব।

কথা বাড়ালাম না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে টাকাটা এনে দিলাম।

এর দুদিন পরের কথা। রাত আটটা নাগাদ শুনি বাইরে বেল বাজছে। বেশ শীত পড়তে শুরু করেছে। এ সময়ে এখানকার লোক সাধারণত অন্যদের বাড়িতে যায় না। ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দেখি, বাইরে গণেশ। আমাকে দেখে বলে উঠল—

স্যার কালকে আপনাকে ভোর পাঁচটায় পুকুরপাড়ের বুড়িগাছতলায় আসতে বলেছেন। ওখানে যে শীতলার থান আছে সেখানটাতে।

—ভোর পাঁচটায়? কেন?

—না, মানে উনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন, বললেন আপনার ভালো লাগবে।

ব্যস্ত হয়ে বলে উঠি—না, না অত ভোরে আমি কোথাও যাব না।

গণেশ হেসে বলল—না, না। এবার আপনার উপর পরীক্ষা নয়। গিয়ে দেখবেন। মজা পাবেন। না গেলে খুব মিস করবেন।—বলেই হাঁটা দিল।

আমি ঠিকই করেছিলাম যে যাব না। কিন্তু তবু কেন জানি পৌনে পাঁচটায় উঠে পড়লাম। গায়ে একটা শাল জড়িয়ে টর্চ হাতে বুড়িগাছতলার দিকে হাঁটা দিলাম।

পাঁচ মিনিটের পথ। শীতের রাত চট করে শেষ হয় না। বাইরে বলা যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাতে আবার এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। টর্চ জ্বালিয়ে জল-কাদা পেরিয়ে পৌঁছোতে মিনিট দশেক লাগল।

বুড়িগাছতলায় যখন পৌঁছোলাম পুবের আকাশে সামান্য রং লেগেছে। কিছু পাখির ডানা ঝটপটানির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছ—তার নীচে শীতলার থান। তাকেই আমরা বুড়ি গাছতলা বলি। হঠাৎ দ্রুত পায়ের শব্দ পেলাম। গণেশকে নিয়ে মিঃ পাই কোথা থেকে যেন হঠাৎ করে উদয় হলেন। দেখলাম গণেশ রীতিমতো হাঁফাচ্ছে। আর মিঃ পাই ধমকের সুরে বলছেন—এই সামান্য বয়সে জোরে হাঁটতে গিয়ে হাঁফিয়ে যাচ্ছ গণেশ! নাহ্, তোমার কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমাদের আরও পাঁচমিনিট অপেক্ষা করতে হবে। আপনার এক বিশেষ বন্ধু আসবে।

—আমার বন্ধু! কে?

—আরে, ধৈর্য ধরুন। সবুরে মেওয়া ফলে।

মিঃ পাই-এর হাতে একটা টর্চ মতো কিছু। যদিও সাইজটা বেশ বড়। প্রায় এক ফুট লম্বা।

আমরা কথা বলছি, তার মধ্যে দেখি বিপিনবাবু আসছেন। কল্যাণগড়

হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। খুবই নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। সেদিন ছাত্রদের সামনে কানা হেবোর কাছে চড় খেয়ে অপমানে কেঁদে ফেলেছিলেন। তারপর থেকে আর স্কুলে যাচ্ছেন না। তা উনি হঠাৎ এই ভোর রাতে এখানে!

মিঃ পাই বিপিনবাবুকে দেখে বললেন—শরীর ঠিক আছে তো স্যার? আপনাকে সকাল সকাল এখানে ডাকলাম, তার একটা বিশেষ কারণ আছে। দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারবেন কেন ডেকেছি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দু-মিনিটের মধ্যে শুনি ভারী পায়ের শব্দ এদিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ করে আবছা আলোতে আগন্তুকের মুখ দেখে চমকে উঠলাম। কানা হেবো। ভয়ে বিপিনবাবুর মুখ সাদা হয়ে গেছে। কানা হেবোর হাতে একটা থলি। আমাদের দেখে কড়া গলায় বলে উঠল—এ সবের মানে কী মিঃ পাই? বলা হয়েছিল একা আসতে। বন্দুক লাগবে। টাকা কোথায়?

একটু থেমে আবার ধমকে উঠল—একটু চালাকি হয়েছে কী, সবকটাকে মেরে মাটির নীচে পুঁতে ফেলব। এরা এখানে কী করছে?

মিঃ পাই বেশ সপ্রতিভ ভাবে এগিয়ে গেলেন হেবোর দিকে, তারপর বললেন—না, না—বন্দুক তো কিনবই। তার আগে—একটু দেখি ভাই—বলে যেটা করলেন সেটার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। ওনার হাতের টর্চের মতো জিনিসটার থেকে একটা ফ্ল্যাশ হেবোর মুখের উপর গিয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে হেবোর বিশাল চেহারাটা ছিট্‌কে দু-ফুট দূরের মাটিতে গিয়ে পড়ল।

বলে উঠলাম—সর্বনাশ! মেরে ফেললেন না কি?

—না, না। দু-মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান ফিরবে। তখনই দেখব এক্সপেরিমেন্টটা কাজ করে কি না। বলে গণেশের দিকে তাকিয়ে বললেন—ঠিক যন্ত্রটা নিয়েছিলে তো?

গণেশ দেখি কাঁদো কাঁদো মুখে বলে উঠল—আসলে ঘরে আলো কম ছিল তো—ঘুম ঘুম ভাবটাও ছিল। তাই টেবিলের ওপর যেটা ছিল সেটাই নিয়ে—

মিঃ পাই গম্ভীর মুখে বললেন—না, না। আরেকটু কেয়ারফুল হওয়া

উচিত ছিল গণেশ। ঠিক যন্ত্রটা না হলে আমাদের আজ কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছ? এই মাটির নীচে...

এর মধ্যে দেখি হেবো উঠে বসেছে। গোল গোল চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর যেটা করল সেটার জন্যেও আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। অন্তত আমি আর বিপিনবাবু তো নই-ই।

হামাগুড়ি দিয়ে বিপিনবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিলডাউন হয়ে বসল। তারপর কান ধরে বলে উঠল—স্যার আর কখনো অঙ্ক টুকব না। ক্ষমা করে দিন স্যার।

বিপিনবাবু তখনও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মিঃ পাই বলে উঠলেন—এটা আমার ছোট্ট আবিষ্কার। ওই একটা ফ্ল্যাশে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি কুড়ি বছর আগে। তখন ও বোধহয় ক্লাস নাইনে পড়ত। আর আপনি ছিলেন অঙ্কের টিচার। ও সেকথাই বলছে।

হেবো ইতিমধ্যে কান ধরে ওঠবোস শুরু করেছে। মিঃ পাই গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন—পরীক্ষায় বই দেখে দেখে অঙ্ক টুকেছিলে—কেন? এর শাস্তি কী জানো?

—হ্যাঁ, জানি স্যার। আর কোনওদিন করব না। ওই শান্তনুই আমাকে বলল। অঙ্কের বইটা ও-ই ক্লাসে নিয়ে এসেছিল।

—আর লাস্ট বেঞ্চে বসে দুজনে মিলে বই দেখে অঙ্ক টুকেছ—তাও আবার ভুল অঙ্ক।

বিপিনবাবু গম্ভীরভাবে ধমকের সুরে বলে উঠলেন—সারা বছর ফাঁকি দেওয়ার ফল। কতবার বলেছি যে অঙ্ক এমন একটা জিনিস যে সারাবছর না করলে মাথায় ঢোকে না।

—আর করব না স্যার!—ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করেছে হেবো।

বিপিনবাবু উৎসাহিত হয়ে হেডটিচারের মেজাজে কানটা ধরে আচ্ছা করে মুলে দিলেন। তারপর বললেন—এক পা তুলে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাক।

হেবো তাই করল।

আমি পাশ থেকে মিঃ পাইকে জিগ্যেস করলাম—আমিও কি দু-একটা

চড় থাপ্পড় মারতে পারি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। মারুন না।

আমিও সপাটে একটা চড় মারলাম গালে। কয়েকদিন আগে স্কুলে যাবার পথে আমার মেয়েকে উলটোপালটা কথা বলে বিরক্ত করছিল। অন্য গালটাতেও আর একটা চড় মারলাম। কালীপুজোর চাঁদাটার কথা মনে করে।

হেবো দেখি বাচ্চা ছেলের মতো কান ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে। আর মাঝেমধ্যে পা পালটে ব্যালান্স রাখার চেষ্টা করছে।

মিঃ পাই-কে জিগ্যেস করলাম—তা ও এখন থেকে এরকমই থাকবে? ক্লাস নাইনের ছাত্রের অবস্থায়?

—না, না। এ তো এক্সপেরিমেন্ট। এক-দেড় ঘণ্টা বাদে আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, মস্তিষ্কের অ্যামিগডেলা থেকে পুরোনো স্মৃতি যেভাবে জাগিয়ে দিয়েছি তাতে স্বভাব খানিকটা পালটাবে আশা করি। এ যন্ত্রটার নাম দিয়েছি 'কৈশোরের হামাগুড়ি'। এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি।

উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলাম—তার মানে? এই যে চড় মারলাম—মানে দু-দুটো চড় সেটা কি মনে থাকবে? তাহলে তো আমার সর্বনাশ! আমাকে তো আর আস্ত রাখবে না।

মিঃ পাই খুব গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন—আমাদের মস্তিষ্ক খুবই জটিল। এসব নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করলে তো ঠিকভাবে বলা যায় না—কী মনে থাকবে আর কী মনে থাকবে না। তবে হ্যাঁ, মনে থাকলে আমাদের সবারই একটু বিপদ তো হবেই। আপনার তো আরও বেশি। এমনিতেও অত জোরে চড় মারাটা উচিত হয়নি। চলুন যাওয়া যাক। আমার ওর কান্না শুনতে একদমই ভালো লাগছে না। হেবো এখানেই কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকুক।

তারপর গণেশের দিকে তাকিয়ে বললেন—চলো, চলো গণেশ। বাড়িতে গিয়ে আজ অনেক কাজ। তোমাকে আমার জন্যে আজকে একটা চিলের বাচ্চা ধরে আনতে হবে।

যাওয়ার আগে পাশে পড়ে থাকা থলেটা হাতে নিয়ে মিঃ পাই একবার

ভেতরটা দেখলেন। তারপর বলে উঠলেন—দেখেছ! চাইতে না চাইতেই পাঁচটা বিদেশি রিভলভার হাজির। ভালো দাম দেব বলেছিলাম। এগুলো সব পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে। বলে থলেটা নিয়ে তড়বড়িয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। পিছনে পিছনে গণেশ।

আমি আর বিপিনবাবুও বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। এখানে কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে কে জানে! এমনিতেই মিঃ পাই যা বললেন তাতে হার্টবিট বেড়ে গেছে। শেষে অন্য জায়গায় না বাড়ি খুঁজতে হয়। চড় খাওয়ার কথা মনে পড়লে হেবো আমাকে সহজে ছাড়বে না।

এর কিছুদিন পরের কথা। বলতে নেই এখনও বেশ সুস্থ শরীরে বেঁচে-বর্তে আছি। কানা হেবো পাড়ার মোড়ে একটা বইয়ের দোকান খুলেছে। তবে বিক্রি-বাটা কীরকম হয় জানি না। কারণ যখনই দোকানের সামনে দিয়ে যাই, দেখি একমনে অঙ্ক কষছে। সেদিনের ঘটনা ও মনে রেখেছে বলে মনে হয় না।

একদিন আমি আর বিপিনবাবু সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমাদের দেখে ছুটে এল। বিপিনবাবুকে প্রণাম করে বলে উঠল—স্যার, আসুন। একটু চা খেয়ে যান। আর যদি দু-একটা চক্রবৃদ্ধির অঙ্কও দিয়ে দেন। দিনরাত অঙ্ক করছি। দেখবেন, আমি আগের থেকে অনেক ভালো পারছি।

চা-মিষ্টি খেয়ে—কিছু অঙ্ক করতে দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। হেবোর অঙ্কের স্ট্যান্ডার্ড ভালো হয়েছে, সন্দেহ নেই।

মিঃ পাই-এর সঙ্গে সেদিনের পরে আর দেখা হয়নি। তবে আজ সন্ধেবেলা দরজার নীচে একটা কাগজের টুকরো পেলাম।

—আগামী পরশু রাত চারটের সময় আমার বাড়িতে আসবেন। খুব দরকারি কথা আছে। কাউকে জানাবেন না। আপনার স্ত্রীকেও নয়।—মিঃ পাই।



অনিলিখা ও ভূত

অনিলিখাদি, তুমি কখনও ভূত দেখেছ?

নির্মাল্যর প্রশ্নটা শুনে জল খেতে খেতে বেজায় বিষম খেল বিশ্বজিৎদা। খানিক বাদে সামলে নিয়ে বলে উঠল—হ্যাঁ, অনির তো সবরকম অভিজ্ঞতাই আছে, ভূতটাই বা বাদ যাবে কেন? নাও, শুরু করো অনি। তোমার স্টকে তো সবরকম গল্পই মজুত থাকে। আজ ভূতের গল্প শোনা যাক।

আমাদের শনিবারের আসরে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহে বসবাস নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কিন্তু সে আলোচনা আদৌ জমছিল না। মঙ্গলের থেকে কলকাতা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।

বাইরে শেষ চৈত্রের গরম। বেরোব যে তারও উপায় নেই। অনিলিখাদিও আজকে খুব অন্যমনস্ক। বহুদিন বাদে শনিবারের আসরে এলেও গত এক

ঘণ্টায় সমানে পাশে বসে ফোনে মেসেজ, ছবি ইত্যাদি দেখে গেছে আর মাঝে-মধ্যে 'হুঁ-হাঁ' করে গেছে। জানি না এই প্রশ্ন করে নির্মাল্য অনিলিখাদিকে গল্পে টানার একটা শেষ চেষ্টা করল কিনা! তা না হলে একেবারে মঙ্গল ছেড়ে ভূতে!

অনিলিখাদির মুখে কোনোদিনই ভূতেদের নিয়ে কোনো ঘটনা শুনিনি। সেটা ভয়, নাকি অবহেলা, না স্রেফ অভিজ্ঞতার অভাব তা জানি না।

কোনো উত্তর না পেয়ে আমিই আবার বলে উঠলাম—নাহ্, অনিলিখাদির এ-ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। বিশ্বজিৎদা, তোমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে বলো না!

অনিলিখাদি এতক্ষণে ফোন থেকে চোখ সরিয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপরে কপাল থেকে একগোছা চুল সরিয়ে মুচকি হেসে বলে উঠল, তুই যদি আজকে একঘণ্টা আগে প্রশ্নটা করতিস, বলতাম না, দেখিনি। কিন্তু এখন তো আর তা বলতে পারছি না।

তার মানে? এই ঘরে গত এক-ঘণ্টায় ভূত এসেছিল। আর তোমার সঙ্গে দেখা করে চলে গেছে!

বিশ্বজিৎদার উস্কানিতে কান না দিয়ে বেশ শান্তভাবে অনিলিখা বলে উঠল, বলছি। বুঝিয়ে বলছি।

আমরা সবাই নড়েচড়ে বসলাম। তন্ময় গল্পের গন্ধ পেয়ে একবার ছুটে ঘরের ভেতরে গিয়ে চায়ের কথা বলে এল।

অনিলিখা অবশ্য চায়ের অপেক্ষা না করেই বলতে শুরু করল—

সেদিনটা ছিল সত্যি অন্যরকম। হঠাৎ করে যেন ঘন কুয়াশায় রাস্তা জবরদখল হয়ে গেছে। রোববার সন্ধেতে এমনিতেই রাস্তায় গাড়ি চলাচল কম হয়। তারপরে এরকম কুয়াশা। রাস্তায় কোনো গাড়ি ছিল না বললেই চলে।

কোথায় অনিলিখাদি?

আমি ওয়েলসের একটা ছোট শহরের কথা বলছি। নাম কারলিয়ন। তা ওখানে আগের বছর কিছুদিনের জন্য গিয়েছিলাম, জানিসই তো!

হ্যাঁ, ইংল্যান্ডে তো।

উঁহু। ইংল্যান্ড নয়, ওয়েলস। আলাদা দেশ। লোকজনও অন্যরকম।

অনেক বেশি প্রাণখোলা। ইউনাইটেড কিংডমের মধ্যে অবশ্য পড়ে। তা সে-কথা থাক। যা বলছিলাম। সেদিন আমাকে বাধ্য হয়ে কাজের চাপে অফিসে যেতে হয়েছিল। ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল।

পাহাড়ি পথ পেরিয়ে কারলিয়নে ঢোকার মুখে আস্ক নদী পেরোনোর পরে গাড়ি আস্তে করে দিতে হল। সরু রাস্তা। আঁকাবাঁকা পথ। তার উপরে সামনে পাঁচ ফুটের বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে না। মেঘ-কুয়াশা যেন একসঙ্গে বিদ্রোহ করে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার ধারের হলুদ দাগগুলো দেখা যাচ্ছে না। একবার গাড়ি বাঁ-পাশের নীচু ফুটপাথেও উঠে গেল। সিগন্যালের হলুদ-সবুজ-লাল আলোগুলোও যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। গাড়ি বারবার সামনে থেকে ঘিরে-ধরা কুয়াশার পাকস্থলীতে ঢুকে যাচ্ছে, আবার বেরিয়ে আসছে।

তা এটা কি শীতের সময়?—অভীক বলে উঠল।

হ্যাঁ, শীতের শেষ দিক। খুব সম্ভবত ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি।

আচ্ছা, তোরা বারবার প্রশ্ন করে অনিকে থামাচ্ছিস কেন বল তো? গল্প ভুলে যাবে না। এটা কি বেড়ানোর গল্প পেয়েছিস? শীত বা বসন্ত যাই হোক না কেন, ভূত এলেই হল।—বিশ্বজিৎদা বলে উঠল।

অনিলিখাদি ফের শুরু করল, তা ভাবলাম, এর মধ্যে গাড়ি চালানোর রিস্ক নেব না। একটু রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাই। সামনে একটা লোক এসে পড়লেও দেখার উপায় নেই।

পাশেই রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটার। তার সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। বড় খোলা মাঠ। পুরোটাই ইউনেস্কোর হেরিটেজ সাইট। তাই আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই। ওখানেই গিয়ে গাড়ি দাঁড় করালাম।

বিশ্বজিৎদা আবার কেশে উঠল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে অনিলিখাদি বলে উঠল, অ্যাম্ফিথিয়েটার কিন্তু শুধু রোমেই আছে তা নয়। রোমান সাম্রাজ্য রোম ছাড়িয়ে অনেক দূরে দূরে—এমনকী এখনকার ওয়েলসেও ছড়িয়ে পড়েছিল! আর তাই নানান দেশে ছড়িয়ে থাকা আঠাশটা লিজিয়নের মধ্যে একটা লিজিয়ন প্রায় দুশো বছর ধরে রোমান সম্রাট অগাস্টাসের সময় থেকে কারলিয়নেই ছিল।

তা একটা লিজিয়নে কত সেনা থাকত?—বিবেক বলে উঠল।

একটা লিজিয়নে ঠিক কত সেনা থাকত তা জানি না। তবে সেই সময়ে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার সেনা থাকত কারলিয়নে। আর তাই সব থেকে অক্ষত অ্যাম্ফিথিয়েটারগুলোর একটা আজও কারলিয়নেই। এই অ্যাম্ফিথিয়েটারে শুধু যে গ্ল্যাডিয়েটর শো হত তাই না, এখানে সেনাদের ট্রেনিংও দেওয়া হত। আমি দিনের বেলায় বহুবার এই অ্যাম্ফিথিয়েটারে এসেছি। কিন্তু ইচ্ছে ছিল কোনো একদিন রাতে আসব। তা ভাবলাম এই সুযোগে সন্ধের আলোয় অ্যাম্ফিথিয়েটার একবার দেখে নিই। তার অবশ্য একটা কারণও ছিল।

কী কারণ অনিলিখাদি? ভূত?—নির্মাল্য ফের বলে উঠল।

হ্যাঁ, সেরকমই কুখ্যাতি আছে জায়গাটার। কুখ্যাতিটা এতটাই বাড়াবাড়ি রকমের যে ২০০৮ সাল থেকে কয়েকজন বিজ্ঞানী ওই জায়গাটার উপরে রিসার্চও শুরু করেছেন। মজার ব্যাপার হল তাঁরা কিছুদিনের মধ্যেই অদ্ভুত কিছু ঘটনাও লক্ষ করেছেন। ওনাদের লুকিয়ে রাখা ভয়েস রেকর্ডারে ল্যাটিনে দুই রোমান সেনার মধ্যে রাতের কথাবার্তা ধরা পড়েছে। অ্যাম্ফিথিয়েটারে যুদ্ধের প্রস্তুতি—ট্রেনিং-এর শব্দ শোনা গেছে। ঘোড়ায় টানা রথের আওয়াজ মাঝরাতে শোনা গেছে। দর্শকদের মিলিত অস্পষ্ট চিৎকার শোনা গেছে। লুকোনো ভিডিয়ো ক্যামেরায় দেখা গেছে কোনো অজানা গ্ল্যাডিয়েটর নতজানু হয়ে তার প্রাণভিক্ষা করছে দর্শকদের কাছে।

একবার তো মার্ক বলে একজন বিজ্ঞানীর রাতে ওখানে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। হঠাৎ দেখেন ওনার সামনে এক ছায়ামূর্তি এসে হাজির হয়েছে। আর ওনাকে উদ্দেশ করে উত্তেজিত স্বরে আদেশের ভঙ্গিতে বলছে, 'সিন ডেক্স'। দু'বার বলার পরে ছায়ামূর্তি ভ্যানিশ হয়ে যায়। পরে অনেক রিসার্চের পরে মার্ক জানতে পারেন 'সিন ডেক্স' হল এক ধরনের রোমান মার্চিং অর্ডার। কারোরই ওটা জানার কথা ছিল না।

বলো কী? তা এসব শোনার পরেও তুমি গেলে ওখানে?—তন্ময় বলে উঠল।

হ্যাঁ, যদি আমার ভাগ্যেও সেরকম কিছু ভৌতিক অভিজ্ঞতা জোটে। তা ছাড়া আমার এসবে একদমই বিশ্বাস নেই, তা তো তোরা জানিসই। অনেক সময় বিজ্ঞানীরাও অন্যদের ভুল বিশ্বাসে প্রভাবিত হন। হাজার হোক

তাঁরাও তো মানুষ। ভাবলাম নিজের চোখেই দেখা যাক। সত্যি সেরকম কিছু আছে কিনা।

গাড়ি থেকে নেমে অ্যাম্ফিথিয়েটারের দিকে এগিয়ে গেলাম। নীচু পাঁচিল দিয়ে পুরো জায়গাটা ঘেরা। ঢোকার কাঠের নীচু দরজাটা বন্ধ থাকলেও, পাঁচিলের উপর দিয়ে ভেতরটা অনেক দূর অব্দি দেখা যাচ্ছে। ঘন কুয়াশায় স্পষ্ট কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অ্যাম্ফিথিয়েটারের পরে উপত্যকা। তারপরে আস্ক নদী। তারপরে নদীর ওপারে পাহাড়। তা সেসব দেখা না গেলেও দূরে পাহাড়ের উপরের বাড়ির আলোগুলো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যেন এক দীর্ঘ আলোর মালা হাওয়ায় ভাসছে। অ্যাম্ফিথিয়েটারের মধ্যের নীচু অংশটা দেখা না গেলেও ভাঙা পাথরের সিঁড়িগুলোকে শুধু অদৃশ্য চাঁদের স্পর্শে দেখা যাচ্ছে। চারদিক এত চুপচাপ যে নিজের হাঁটার আওয়াজও পাচ্ছিলাম। পাথরের রাস্তায় আমার জুতোর শব্দ।

অ্যাম্ফিথিয়েটারের ধার দিয়ে খানিকটা ঘুরে এলাম একবার। মাঝে-মধ্যে বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আর সে হাওয়ায় ভর করে টুকরো টুকরো মেঘ যেন আমাকে ঘিরে ধরেছে। চারদিকের এই নির্জনতা আর একই সঙ্গে এই পরিবেশ বেশ উপভোগ করছিলাম।

তবে আধঘণ্টা কাটানোর পরেও সেরকম কোনো অভিজ্ঞতা হল না। শেষে গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। হঠাৎ মনে হল কিছু দূরে অন্ধকারের মধ্যে দুটো চোখ জ্বলছে। চমকে উঠলাম। দেখি খানিক দূরে একটা মিশমিশে কালো বেড়াল সবুজ চোখে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। ওটাকে মুখে আওয়াজ করে আদর করার জন্য ডাকলাম। কিন্তু বেড়ালটা আমার ডাকে কোনো সাড়া দিল না। ওখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওর দিকে আরেকটু এগোতেই দেখি বেড়ালটা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। খুঁজে না পেয়ে ওকে ফেলে ফের গাড়ির দিকে এগোলাম। রিমোট দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে গাড়িতে উঠতে যাব, হঠাৎ যেন হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। আমার গাড়ির ঠিক অন্যপাশে অন্ধকারের মধ্যে একটা কমবয়সি বড়জোর বছর কুড়ির মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মাঝারি হাইট। দেখতে ভারী সুন্দর। ঘাড় অব্দি সোনালি চুল। দু'হাজার বছর আগে রোমান সম্ভ্রান্ত মহিলারা যেরকম পোশাক পরত, গায়ে সেরকম

পোশাক। ফুলহাতা গলা থেকে পা অব্দি সাদা টিউনিক। তার উপরে আবার একটা শাল আড়াআড়িভাবে জড়ানো। আর বেল্ট দিয়ে সেটা নীচের টিউনিকের সঙ্গে লাগানো। পোশাকটা বেশ দামি সিল্কের বলে মনে হল।

মেয়েটার চোখ সবুজ রঙের, ওই খানিক আগে দেখা বেড়ালের চোখের মতোই, সেরকম উজ্জ্বল। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে পরিষ্কার ইংরিজিতে বলে উঠল, আপনার গাড়িতে একটু যেতে পারি? খুব বিপদে পড়েছি। বলে কাছাকাছি একটা জায়গার কথা উল্লেখ করল।

তুমি, তুমি কী করলে? গাড়িতে উঠিয়ে নিলে?

কী আর করব? মুখের উপরে 'না' বলা যায়! ওই অপার্থিব পরিবেশে মেয়েটাকে এত সুন্দর মানিয়েছিল, যে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম কিছুক্ষণ। সব যেন হঠাৎ করে দু'হাজার বছর পিছিয়ে গেছে।

গাড়ির অন্যদিকের দরজা খুলে মেয়েটা গাড়িতে আমার পাশের সিটে উঠে বসল। বাইরে থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়া যেন গাড়ির মধ্যে হানা দিল।

ভূতের সঙ্গে গাড়িতে কিছুক্ষণ। পাশ থেকে মুচকি হেসে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল।

কিছুক্ষণ মানে ওই ধরো পনেরো মিনিট। ওইটুকু পথ কীভাবে গাড়ি চালিয়েছিলাম বলতে পারব না। আমার গাড়ির হেডলাইটের আলো সামনের পাকদণ্ডী সরু রাস্তার উপরে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছিল প্রতি মুহূর্তে। রাস্তার দু'পাশের গাছের ছায়াগুলো অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা আততায়ীর মতো বারবার গাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। আর গাড়ির স্পিডও তাই অজান্তে বেড়ে যাচ্ছিল। আমার কোনোদিকে কিছু খেয়াল ছিল না। আড়চোখে যতবার ওর দিকে দেখছিলাম, দেখি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে, আর মুচকি মুচকি হাসছে। রক্তশূন্য সে মুখ। ফ্যাকফ্যাকে সাদা রং। ওর সবুজ চোখের দিকে তাকালেই হার্ট-বিট বেড়ে যাচ্ছিল। পোশাক থেকে একটা অন্য ধরনের পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিলাম। কোনো পরিচিত পারফিউমের নয়। স্বাভাবিক। রোমান মহিলারা বিশেষ কিছু ফুল থেকে তৈরি পারফিউম ব্যবহার করত। এখন সেটা পাওয়া যায় না।

কোনো কথা বলছিল না? আমি বলে উঠি।

না, একেবারে চুপচাপ। আমিও কথা বলার অবস্থায় ছিলাম না। যেখানে যাবে বলেছিল, সেটা আমার বাড়ি থেকে মিনিট কুড়ির পথ। আস্ক বলে একটা জায়গায়। শুনে অবাক হইনি। ওখানেও সেসময়ে বড় রোমান কলোনি ছিল। কয়েক হাজার রোমানদের সেনা ছাউনি ছিল ওখানে। তাই ওখানে যেতে চাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। নিশ্চয়ই আজও ওর অনেক বন্ধু-বান্ধব আস্কে আছে।

খানিক বাদে গাড়ি আস্কে ঢুকল। সরু রাস্তার দু'ধারে পুরোনো দিনের নীচু পাথরের পাঁচিল। ডান পাশে আস্ক নদী। রোমানদের ওয়েলসে আসার মূলেই ছিল এই আস্ক নদী। ওই সময় নৌপথে বাণিজ্য চলত এখান থেকে সুদূর রোম-মিশরের সঙ্গে। সোনা, রুপো, তামা তখনকার দিনে ওয়েলসে অনেক পাওয়া যেত। আর তা এখান থেকে নদীপথে রোমে পাঠানো হত।

ইতিমধ্যে মেয়েটা গাড়ি থামাতে বলে উঠল।

জায়গাটা দেখেই বুঝলাম। থামাতে বলাই স্বাভাবিক।

রাস্তার পাশে একটা বড় পুরোনো দিনের কবরখানা। গাড়িটা রাস্তার ধারে দাঁড় করালাম। দেখলাম কবরখানার পাশে গাছের আড়াল থেকে একটা খুব পুরোনো চার্চও দেখা যাচ্ছে। কবরখানার পাথরের ফলকগুলো গাড়িতে বসেই দেখা যাচ্ছে। সামান্য আলোয় বুঝলাম সবক'টাই বহু আগের। দূরে তিন রাস্তার মোড়ে হলুদ আলো দপদপ করছে। ওয়ার্নিং সাইন। যেন আমার জন্যেই বসানো হয়েছে। আর বলছে আর এদিকে এসো না।

তার—তারপর? মেয়েটা কী করল?

মেয়েটা গাড়ি থেকে নামার আগে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সে কনকনে ঠান্ডা হাত। তারপরে আমার হাতটা ধরে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে উঠল, তোমার জন্যেই এত রাতে ফিরতে পারলাম। না হলে যে কী মুশকিল হত! আমাদের আজ অ্যাম্ফিথিয়েটারে একটা নাটক ছিল রোমানদের উপরে। আমি একটা রোমান মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করছিলাম। শোনা যায় ক্লদিয়া নামে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রোমান মেয়েকে ওর বন্ধু এখানে একটা গ্ল্যাডিয়েটর শো দেখাতে নিয়ে এসে হত্যা করে। জলের মধ্যে বিষ খাইয়ে। এটার পিছনে একটা বড় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র

ছিল। অ্যাম্ফিথিয়েটারের সিঁড়িতে বসেই খাওয়ানো হয়েছিল সেই বিষ-মেশানো জল। তারই অভিনয় করছিলাম। ক্লদিয়ার ভূমিকায়। তাই তো এই পোশাক। নাটক সবার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু তার পরেই এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে বিপদে পড়লাম। এত রাত হয়ে গেল। আগে খেয়াল করিনি। এই ঠান্ডায় এই পরিবেশে বাসের জন্যে আরও কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত কে জানে! আর আজ গাড়িও সঙ্গে ছিল না। ভাগ্য ভালো তোমার দেখা পেলাম। তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাই!

আরও সামান্য কিছু কথা বলে মেয়েটা দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

আর তারপরে আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে ওই কবরখানার দিকে না গিয়ে পাশের সরু পাথর বাঁধানো ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা শুরু করল।

কথা শুনে বুঝলাম যুক্তিবুদ্ধি কিছুক্ষণের জন্য যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম। অহেতুক হাস্যকরভাবে ভূতে বিশ্বাস করে বসেছিলাম। এভাবেই বোধহয় বিশেষ পরিস্থিতিতে লোকে ভূত দেখে।

তবু কেন জানি না আমার মনে হল একটু নেমে দেখি ও কোন দিকে যায়। গাড়ি কবরখানার সামনে রাস্তার ধারে রেখে, ও যে-পথে গেল সেদিকে এগোলাম। কিন্তু খানিক এগিয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না। এদিকের রাস্তা একদম নির্জন। ফিরব, পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, আমাকে খুঁজছেন?

চমকে মাথা ঘুরিয়ে দেখি মেয়েটা যেন কোথা থেকে এসে উদয় হয়েছে। সঙ্গে আরেকজন তাগড়াই চেহারার লোক। তার গায়ে রোমান পোশাক। দামি উলের তৈরি টোগা। মেয়েটা আমাকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, আমার বন্ধু।

বুঝলাম নাটকের দলেরই কেউ হবে। লোকটা আমার উদ্দেশে কী একটা বলে উঠল। কিছু বুঝলাম না। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি না অস্বস্তি হচ্ছিল। তবে রোমান পোশাকে খুব ভালো মানিয়েছে। ঠিক যেন সামনে একটা রোমান মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ লোকটা পরিষ্কার ইংরিজিতে ফের বলে উঠল, কী হল? আমাদেরকে ভূত ভাবলে না তো!—বলে হাত দুটো দিয়ে আমার গলা

টিপে ধরার ভঙ্গি করে জোরে হেসে উঠল।

আমিও অপ্রস্তুতভাবে একটু হেসে উঠলাম। মেয়েটার সঙ্গে আর বেশি কথা বললাম না। দু-একটা কথা বলে গাড়ির দিকে এগোলাম।

তার মানে ওটা ভূত ছিল না! তন্ময় বেজায় নিরাশ হয়ে বলে উঠল।

বিশ্বজিৎদাও একটু নড়েচড়ে বসল। তার পরে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে উঠল, নাহ, অনি—আজ এ গল্প একদমই জমল না। এর থেকে মঙ্গলই ভালো ছিল। ভূতের গল্পে ভূত না থাকলে হয়! আগেই বলে দিতে পারতে ভূত নেই। আমিও না হয় আমার দমদমের বাড়িতে ভূতের সঙ্গে চা খাওয়ার ঘটনাটা বলতাম। ওটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং ছিল।

আমি বলে উঠলাম, আচ্ছা অনিলিখাদি, ওই মেয়েটা অতক্ষণ অ্যাম্ফিথিয়েটারে একা কী করছিল! নাটক নিশ্চয়ই তখনই শেষ হয়নি। তাহলে তো অন্য অনেক লোকেরও দেখা পেতে। ওখানে অ্যাম্ফিথিয়েটারের কাছে তো কোনো বাড়িঘর ছিল না বলেছিলে! ও বন্ধুর বাড়ি গেল, আবার ওখানে ফিরে এল কেন!

গুড কোশ্চেন। আমারও সত্যি তখন ওটা একটু খটকা লেগেছিল। উত্তর পেলাম এতদিন বাদে।

বলে অনিলিখা ওর ফোনটা এগিয়ে দিল। তাতে একটা খবর কাগজের পাতা দেখা যাচ্ছে। ডেলি মিরর। আজকের তৃতীয় পাতা। একটা ভারী সুন্দর দেখতে মেয়ের ছবি তাতে।

এই মেয়েটাই ছিল সেদিন গাড়িতে। অনিলিখা বলে উঠল।

শিওর?

একদম। এত সুন্দর দেখতে এরকম একটা মুখ আর ওরকম সবুজ চোখ চট করে ভোলা যায়!

তা খবরটা কী?—আমরা ফোনের উপরে ঝুঁকে পড়লাম।

এক বছর আগে ওই দিনে মেয়েটা নিখোঁজ হয়ে যায়। কারলিয়নে রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারে একটা নাটকে অভিনয়ের পরে ওকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মানে? তোমার সঙ্গে যেদিন দেখা সেদিনেই?—বিশ্বজিৎদা খানিকটা অবাক হয়ে বলে উঠল।

হ্যাঁ, তারিখটা যা লিখেছে তাতে তো সেই দিনই মনে হয়। সেদিন গাড়ি থেকে নামার সময় মেয়েটা একটা কথা বলেছিল। এখন সেটা বেশি করে মনে পড়ছে।

কী?

বলেছিল, আমি জানি তুমি এতক্ষণ কী ভাবছিলে। তোমার জায়গায় থাকলে আমিও তাই ভাবতাম। ও জায়গাটা সত্যি ভালো নয়। বিশেষ করে ওখানে সত্যি ঘটনার অভিনয় করাটা একদম ঠিক নয়। আমি কারণটা তখন ওকে জিগ্যেস করেছিলাম। ও বলেছিল ওর সঙ্গে বন্ধুর ভূমিকায় নাটকে যে ছিল, তার হাতে জল খাওয়ার সময় ওর যেন হঠাৎ মনে হয়েছিল এ যেন অন্য কেউ। তার সঙ্গে ও কোনোদিন এর আগে অভিনয় করেনি। গলার স্বরও অন্যরকম। আর জল দিয়ে আস্তে আস্তে সে লোকটা ওকে ল্যাটিনে কিছু কথা বলেছিল।

তার মানে?

জানি না। কারণ ওই প্রশ্নটার সেদিন কোনও উত্তর মেয়েটা দেয়নি। শুধু হেসেছিল রহস্যজনকভাবে।—বলে অনিলিখা একটু থেমে ফের বলে উঠল, আজকের কাগজের পুরো খবর এখনও বলিনি।

এতদিন বাদে কাছাকাছির একটা কবরখানা থেকে একটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ডিএনএ ম্যাচ করে দেখা গেছে ওটা নাকি ওই মেয়েটারই। কবরখানাটা ওয়েলসের আস্কে। সেই খবরটাই আজকে কাগজে বেরিয়েছে। মৃতদেহে নাকি বিষ পাওয়া গেছে। আরও লিখেছে, ১৮৯৪-তে ঠিক ওখানে বিখ্যাত রোমান নাট্যকার নেভিয়াসের লেখা ওই একই নাটক শেষবার হয়েছিল। সেবারেও অভিনয়ের পরে অভিনেত্রী মারা যান। নাটকের সময় ওই অভিনেত্রী যে জল পান করেন, সেই জলেই নাকি সেবারে বিষ পাওয়া গিয়েছিল।

তার মানে ওই মেয়েটা ভূতই ছিল? আমরা সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলাম।



মূর্তি

১

আজকে শশীর মন খুব খারাপ। আজকেও কোন মূর্তি বিক্রি হল না। উলটে দোকান থেকে রাজীবকাকুর ধমক খেতে হয়েছে।

—রোজ কতবার করে বলব যে তোর বাবার মূর্তি বিক্রি হয় না! আগেরটা বিক্রি হলে, তবে তো আবার নতুন কিনব? বাবাকে বলিস ঘোড়ার মূর্তি তৈরি করতে বা ঠাকুর-দেবতার মূর্তি। দুর্গার—সরস্বতীর—গণেশের মূর্তি তৈরি করতে পারে। তাও কিছু কেনার লোক থাকে। আর সেটাও যদি না পারে, তো থালা বাটি গেলাস—এসব কাজের জিনিসও তো তৈরি করতে পারে! তাও যদি কোনওটা বিক্রি হয়! তোর বাবা যে

কী সব হাবিজাবি জিনিস তৈরি করে, তার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝি না। কাস্টমার কিনবে কেন? তাও তো আমি ওগুলো আমার দোকানে রাখি। নগেনের দোকানে গিয়ে দেখ। রাখবেই না।

মাথা নীচু করে কাঁপা গলায় বলেছিল শশী—ঠিক আছে কাকু। কালকে আসব। বাবা বলে রোজ আসতে। যদি কাল বিক্রি হয়ে যায়। আর তোমার কাছে যদি বাবার তৈরি কোনও মূর্তি না থাকে! যদি কেউ কিনতে এসে ফিরে যায়?

—না না, আর জ্বালাস না। আর আসবি না। দরকার হলে আমিই জানাব। যা বেরিয়ে যা। এতদিন বিক্রি হল না। কালকেই বিক্রি হয়ে যাবে!—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল রাজীবকাকু।

শশী আর থাকেনি। বোনের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল। তবে বাড়ি ফিরে যায়নি। একটু দূর থেকে দোকানটার উপরে নজর রেখেছিল। যদি কেউ কিনতে আসে। রাজীবকাকুর দোকানটা বেশ বড়। শহরের মূল বাজারের মধ্যে। তাই টুরিস্টদের বড় একটা অংশ এখানে আসে। ওরা তারই উলটো দিকের রাস্তায় খানিক দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

রোদ বাড়ছে। জ্যৈষ্ঠ মাস। তেতে-ওঠা রাস্তার তাপ ছেঁড়া চটির ফাঁক দিয়ে পায়ে লাগছে। খিদেও পাচ্ছে। কিন্তু আজকে ওদের একটা মূর্তি বিক্রি করতেই হবে। বাবার দুটো মূর্তি আছে দোকানটাতে। যে-কোনও একটা বিক্রি হলেই হল। দূর থেকে এখনও মূর্তি দুটো দেখা যাচ্ছে। একটা ঘোড়ার উপরে দুটো বাচ্চা ওঠার চেষ্টা করছে। আর ঘোড়াটা যেন অসুস্থ। মাটির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় সাড়ে তিন ফুটের মতো লম্বা ঘোড়াটা, আর উচ্চতায় প্রায় দু-ফুট। বাবা যখন মূর্তিটা তৈরি করছিল, তখন শশীকে ডেকে ডেকে বলত—বুঝলি যাদের কথা আমরা বুঝি না, তাদের কথাও বোঝা যায় তাদের খুঁটিয়ে লক্ষ করলে। কানের দিকটা লক্ষ কর। তাকানোটা লক্ষ কর। ঘাড়ের দিকটা লক্ষ কর। সামান্য ঢেউ খেলানো ভাবটা দেখেছিস?—বলে আবার ঘোড়াটার গলার উপরে হাত বোলাত, আবার মাটির প্রলেপ দিত। তিন ঘণ্টা বাদেও শশী দেখত, বাবা তখনও ঘোড়ার উপরেই কাজ করে যাচ্ছে।

অন্য মূর্তিটা বোঝা আরও শক্ত। তিনটে লোক তিন ধরনের পোশাকে

একটা শুয়ে থাকা অসুস্থ লোককে ঘিরে বসে আছে। আর আঙুল তুলে নিজেদের মধ্যে তর্ক করে যাচ্ছে। শুয়ে থাকা লোকটা অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাবার কথা মনে পড়ল শশীর—শুয়ে থাকা লোকটার মুখটা খেয়াল কর। একদিকে যন্ত্রণা, অন্যদিকে চারদিকে কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না।

—তা বাবা ওরা ডাক্তার ডাকেনি কেন?

—সব চিকিৎসায় কি আর ডাক্তার লাগে? এ হল আমাদের সমাজের ছবি। বড় হলে বুঝবি।

সত্যিই শশী বোঝেনি। শুধু এতদিনে এটুকু বুঝেছে বাবার একটা অন্য ভাষা আছে। আর সেটা সবাই বুঝতে পারে না। তাই তো বিক্রি হয় না! বাবার তৈরি দুটো মূর্তিই অন্যসব মূর্তিগুলোর থেকে এত আলাদা, শশীরই মাঝেমধ্যে অবাক লাগে, বাবা এরকম সব অদ্ভুত ধরনের টেরাকোটার মূর্তি করে কেন! আর তাও আবার এত কষ্ট করে। মা রোদে মূর্তি শুকোতে দিলেও বাবা ঠিক এসে বারবার দেখে যাবে, আর সময় অনুযায়ী সরিয়ে সরিয়ে রাখবে। মূর্তিটাকে নানান দিক দিয়ে দেখবে। আর বারবার ছোট ছোট পরিবর্তন করবে।

শশীর চোখটা যেন একটু ঝাপসা হয়ে উঠল। পিছনের দোকান থেকে কচুরির গন্ধ আসছে। যেদিন মূর্তিটা বিক্রি হবে, এক ঠোঙা কচুরি ও কিনবেই। ওর জন্য, বোনের জন্য, সবার জন্য।

বাড়ির ভাড়া নিতে আজকে দীপুকাকু আসবে। দীপুকাকু এমনি লোক ভালো। কিন্তু আগের দুবারেই বলে গিয়েছিল—আর ভাড়া না দিলে চলবে না। আমারও তো সংসার আছে, তাই না!

দীপুকাকু না বললেও বাবা যে আর ভাড়া না দিয়ে ও বাড়িতে থাকবে না, তা শশী জানে। বাবার আত্মসম্মানবোধ খুব বেশি। আগের বারে ভাড়া দেওয়ার সময় বাবা খুব প্রিয় দামি পেনটা বিক্রি করে দিয়েছিল। পেনটা ঠাকুরদার ছিল।

রোজ সকালে একবার করে পেনটা হাতে নিয়ে বাবা কাগজের উপরে কীসব লিখত খানিকক্ষণ ধরে। জিগ্যেস করলে বলত—এটা আমার বাবার

ছিল বুঝলি। এটা দিয়েই বাবা সব কবিতা লিখত। হাত রাখলে এখনও মনে হয় বাবার আঙুলগুলো ছুঁয়ে আছি।

তা সে পেনটাও বিক্রি করে দিতে হল। দোকান থেকে বেরিয়ে আসার পরে বাবা অনেকক্ষণ কিছু কথা বলছিল না।

শশীই তখন সান্ত্বনা দিয়েছিল।—মন খারাপ কোরো না বাবা, আমি বড় হয়ে ওই পেনটাই কিনে দেবো তোমায়।

বাবা কোন উত্তর দেয়নি। কিন্তু শশী কথাটা হাল্কা ভাবে বলেনি। ঠিক, কোন না কোনওদিন ফিরিয়ে আনবেই পেনটাকে।

এই যে রাজীবকাকুর দোকানে বাবা আসে না, ওদের পাঠায়, তারও একই কারণ। বাবা অপমান সহ্য করতে পারে না।

তা এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ শশীর চোখ পড়ল আবার উলটো দিকের রাজীবকাকুর দোকানে।

দোকানটাতে একটা বিদেশিদের বড় গ্রুপ ঢুকছে। ওরা যদি কেনে। কিন্তু না। বেশ খানিকক্ষণ পরে ওরা যখন বেরিয়ে এল, তখনও শশী দেখতে পেল বাবার টেরাকোটার মূর্তি দুটো ওখানে ঠিক একইভাবে রাখা আছে। হয়তো রাজীবকাকু ঠিকই বলে। বাবার কাজ ভালো না। তবে বাবা যে এত যত্ন নিয়ে কাজ করে, তার কি কোনও দাম নেই!

বাবা যে কাজটা করে, সেটা যাতে আরও ভালো করে হয়, তা নিয়ে শশী বাবাকে একবার বলেছিল। পাশ থেকে মার বকা খেয়েছিল তার জন্য।

বাবা কিন্তু রাগেনি। মুচকি হেসে বলেছিল—বুঝলি রে পটাই, এবারেরটা একেবারে মাস্টারপিস হবে।

ওকে ওর বাবা পটাই বলে ডাকে। আদরের ডাক।

—মাস্টারপিস কী বাবা?

বাবা খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল, তার পরে বলে উঠেছিল—যেটা ঠিক বিক্রি হয়ে যাবে। আর কিছু দিনের জন্য অন্তত তোদের খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধে হবে না।

বলে আবার মূর্তি গড়ায় হাত লাগিয়েছিল বাবা।

সে কাজটা আজকেও চলছে। আরও কিছু দিন লাগবে শেষ করতে। বাড়ি ছাড়লে কী করে কাজটা শেষ হবে কে জানে!

—দাদা, বাড়ি যাবে?—রুনুর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল শশী। সকাল থেকে প্রায় না খেয়েই আছে রুনু। ওর কতই বা বয়স? সাতে পড়ল। তবু দুজনে মাঝে মধ্যে ভারী মূর্তি ধরে আনলে সুবিধে হয় বলে ওকে নিয়ে আসা। আজকে অবশ্য মূর্তি নেই ওদের সঙ্গে। তবু রুনুকে সঙ্গে নিয়ে আসলে কীরকম যেন একটু সাহসী লাগে।

—চল, যাওয়া যাক রুনু।

—বাবাকে কি বলবে দাদা?

—কি আর বলব! বলব মূর্তি এখনও বিক্রি হয়নি।—বলেই থামল শশী। এটা এখন কীভাবে বলা যায় ভাবতে হবে। আসলে রোজ রোজ মূর্তি বিক্রি হয়নি বলতে ভালো লাগে না শশীর। শুনলেই বাবার মুখটা কীরকম শুকিয়ে যায়। ঠিক তেমনই মারও। বাবা বোধহয় আরও বেশি আঘাত পায়, তার শিল্পকাজের কোনও কদর নেই ভেবে।

তাই খুশি করতেই বাবাকে কাল মিথ্যে কথাটা বলেছিল শশী। বিক্রি হয়ে গেছে। আর দিন দুয়েকের মধ্যেই টাকাটা দিয়ে দেবে রাজীবকাকু। কিন্তু এখন ও কীভাবে আসল কথাটা বলবে যে মূর্তিটা এখনও বিক্রি হয়নি!

—বুঝলি বলে দেব যে কিনেছিল, সেই আবার ফেরত দিয়ে গেছে। ব্যস তাহলেই হবে!

বলতে গিয়েই এতোটা খারাপ লাগল শশীর যে ও মুহূর্তে বুঝল এটা ও বাবাকে কোনওভাবে বলতে পারবে না। কী বলবে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ ওর চোখ পড়ল দোকানের নতুন আগন্তুকের দিকে। বয়স্ক লোক। মুখে চোখে কীরকম যেন রাগ রাগ ভাব। ভুরু কুঁচকে তাকায়। নাকের উপরে ভারী কালো চশমা। এই লোকটা মাঝে-মধ্যেই দোকানে আসে। আর কিছু কিনেও নিয়ে যায়। কালকে ওর বাবার তৈরি মূর্তিটার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। একটু আশা করে পাশে এগিয়ে গিয়ে শশী বলে উঠেছিল—এটা আমার বাবার করা। নেবেন?

লোকটা কোন কথা বলেনি। চুপ করে আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল মূর্তিটার সামনে। কিন্তু শেষে কেনেনি।

লোকটার গায়ে দামি পাঞ্জাবি, হাতে দামি ঘড়ি। রং করা চুল। পায়ে

শৌখিন চটি। শশীর মনে হচ্ছিল বলে ওঠে—এটা কিনেই নিন না! কতই বা টাকার ব্যাপার আপনার কাছে। অন্তত আমরা একটা দিনের জন্য আনন্দে থাকি।

কিন্তু শেষে বলতে পারেনি।

আজকেও শশী দূর থেকে লক্ষ করল। লোকটা আবার বাবার তৈরি দুটো মূর্তি অনেকক্ষণ ধরে নেড়েচেড়ে রেখে দিল। নিজের অজান্তে দীর্ঘশ্বাস পড়ল শশীর। আর দেরি না করে রুনুর হাত ধরে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

২

রাত বাড়ছে। হ্যারিকেনের আলোয় মূর্তি তৈরির কাজ এখনও চলছে। একটা কাঠের টেবিলের উপরে মূর্তিটা রেখে শশীর বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পাশে টেবিলের উপরে টুল বক্স রাখা। তাতে ব্রাশ, ক্যালিপার, অ্যালুমিনিয়ামের তার, স্টিলের তার, কাঠের ছুরি, একটা গোল পাথর—আরও অনেক কিছু রাখা। মূর্তি তৈরির জন্য বেশ কিছু যন্ত্র শশীর বাবা নিজের হাতেই তৈরি করেছে। আর সময় পেলেই তা নেড়েচেড়ে দেখে।

আজকের এই মূর্তিতে বেশ কিছু সেনা সারি করে যুদ্ধের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে বই। মুখে বিভ্রান্তির ছাপ। শশীর বাবা মগ্ন হয়ে সেনাদের চোখে ব্রাশ বোলাচ্ছে।

হঠাৎ বাইরে দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনে চমকে উঠল ওরা। নির্ঘাত দীপুকাকু ভাড়া নিতে এসেছে। বাবার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আবার ধাক্কা।

আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল শশীর বাবা। শশীর মা ঘরের ভিতরের দিকে রান্না করছিল। রান্না ছেড়ে শশীর মাও এগিয়ে এল।

বাবার পিছনে পিছনে শশী এগিয়ে গেল। কিন্তু দরজা খুলতেই ওরা অবাক। দীপুকাকু নয়। শশীর চেনা সকালের সেই বুড়োটা।

বুড়োটা ঘরের মধ্যে ঢুকে বাবার হাতে একটা ছোট ভিজিটিং কার্ড তুলে দিল।

বাবা কার্ডটা দেখে অবাক হয়ে বলে উঠল—রামকিঙ্কর বল! আপনার মতো এত বড় শিল্পী আমার বাড়িতে। কী সৌভাগ্য! আমি আপনার কাজের খুব বড় ভক্ত। বসুন বসুন।

বলে ঘরের একমাত্র অক্ষত কাঠের চেয়ারটাকে এগিয়ে দিল।

রামকিঙ্করবাবু চেয়ারে বসে বলে উঠল—বেশিক্ষণ বসব না। তোমার বাড়ি খুঁজে পেতেই অনেক সময় লেগে গেল। আবার কলকাতায় ফিরতে হবে। তা আমার সাম্প্রতিক কাজগুলো দেখেছ?

—না, আমার তো কলকাতা অত যাওয়া হয় না। কয়েকবছর আগে একবার আপনার কাজ দেখতে কলকাতায় একটা একজিবিশনে গিয়েছিলাম। কী অসাধারণ সব কাজ!

মুচকি হেসে উঠল রামকিঙ্করবাবু। এই প্রথম হাসতে দেখল শশী। তারপরে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা রঙিন কাগজ শশীর বাবার হাতে দিয়ে বলে উঠল—এই মূর্তিগুলো চিনতে পারছ?

কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে অবাক হয়ে শশীর বাবা বলে উঠল—কী আশ্চর্য! আমিও একই ধরনের কাজ করেছি। এত সুন্দর নয় অবশ্য।

—এ তোমারই কাজ বলতে পারো! আর আমার দিক দিয়ে চুরিই বলতে পারো। আমি কয়েকবছর আগে এখানে বেড়াতে এসে প্রথম তোমার কাজ দেখি। তখন আমার ভালো সময় যাচ্ছিল না। হঠাৎ করে যেন কিছুদিন নতুন কোনও কিছু ভাবতে পারছিলাম না। তোমার কাজ দেখে শুধু মুগ্ধই হইনি, ফের নতুন ভাবে সব কাজ শুরু করতে ইচ্ছে হয়েছিল। আর তখন থেকেই যখনই তুমি কোনও কাজ করেছ, আমি তার থেকে আইডিয়া নিয়েছি। তোমার মূর্তি এখানে বিক্রি হয়নি, আর আমার মূর্তি কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। দুটোর মধ্যে কী তফাত জানো?—বলে আবার আঙুল তুলে বাবার হাতে রাখা ভিজিটিং কার্ডটা দেখিয়ে বলে উঠল—ওটা। আমার পরিচয়।

—কি-কিন্তু। আমার মূর্তি তো বিক্রিই হয় না!

—এবার থেকে হবে। আমি চাই আমার সঙ্গে তোমার মূর্তিও একই একজিবিশনে থাকুক। বলতে পারো ওটাই হবে আমার গুরুদক্ষিণা।—বলে

একটু থেমে ফের বলে উঠল—আগেই করতে পারতাম। কিন্তু ভয় পেতাম। মনে হত এত অভাব আছে বলেই হয়তো এত সুন্দর কাজ করো তুমি। তোমার মূর্তিতে এত আবেগ, এত গভীরতা, এত নতুনত্ব। তাই দুটো বাচ্চা উঠতে গিয়েও রুগ্ন ঘোড়ায় উঠতে পারে না। আর ঘোড়ার সঙ্গে কোথায় যেন তুমি মিলে যাও। আমি আগে তোমাকেও জানাতে চাইনি।

—আপনি আমায় লজ্জায় ফেলছেন। আমি আপনার ছাত্র হওয়ারও যোগ্য নই। আপনার মতো শিল্পী আমার কাজের মধ্যে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছেন, এটাই যথেষ্ট আমার কাছে।

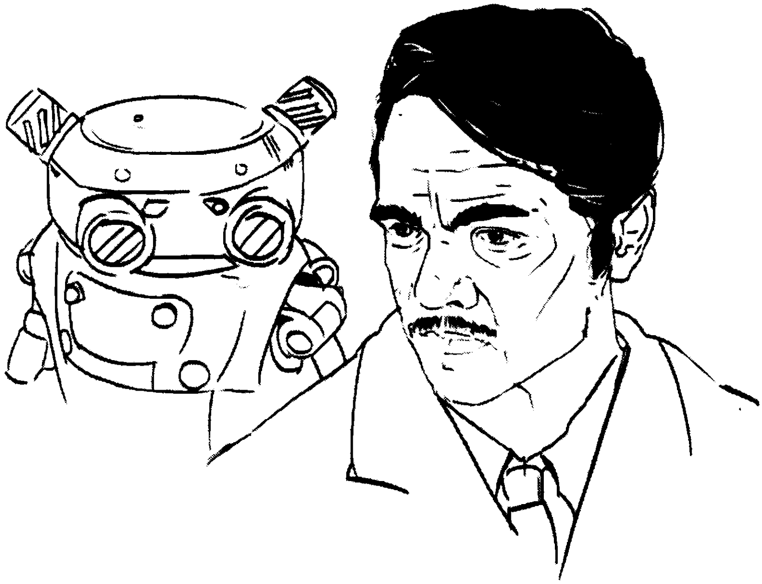
—তা দেখি, এখন তুমি কোন মূর্তি তৈরি করছ?

শশীর বাবা টেবিলের দিকে দেখাতে রামকিঙ্করবাবু উঠে ওদিকে এগিয়ে গেল।

এগিয়ে এসে নতুন মূর্তিটা খানিকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখে বলে উঠল—এটাই মনে হয় আমার দেখা তোমার সেরা কাজ। ঠিকই বুঝেছিলাম। আর তাই আগের দুটো এতদিন কিনিনি। আমি চাইছিলাম তোমার সেরা মূর্তিটা তুমি তৈরি করো। ভুল আশা করিনি। অসাধারণ! অভাব না থাকলে কি আর এরকম সৃষ্টি সম্ভব?

বলে পকেট থেকে একটা চেক এগিয়ে দিল শশীর বাবার হাতে।—কোনও টাকা দিয়ে এ মূর্তি কেনা যায় না। আর আমি কিনবও না। এটা স্থান পাবে আমার সামনের একজিবিশনে। এক মাস পরে। তার মধ্যে যেন এ কাজ শেষ হয় দেখো। তুমিও যাবে। সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেব আগামি দিনের এক সেরা শিল্প-প্রতিভার সঙ্গে। শেষ করো আস্তে আস্তে। শুধু কিছু টাকা আগে থেকে দিয়ে গেলাম, যাতে তোমাদের কয়েক বছরের বাড়ি ভাড়া নিয়ে চিন্তা না করতে হয়!—বলে শশীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—কি খোকা খুশি তো?

শশী ঘাড় ঘুরিয়ে আবার মূর্তিটাকে দেখল। সেনাগুলো যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। যুদ্ধের ভঙ্গিতে নয়। হাসি মুখে।



ফ্লাইট নাম্বার ৩২

আর ঠিক এক ঘণ্টা। তারপরেই সব শেষ। নির্মাল্যর জীবনে অনেক কিছুই অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু হল না। অনেক কিছুই ও করতে চেয়েছিল, কিন্তু কিছুই প্ল্যান মাফিক হল না। দীর্ঘশ্বাস পড়ল নির্মাল্যর। জীবনের শেষ কাজটা অন্তত ও ঠিকভাবে করে যেতে চায়। এ কাজটা এমনই যে ও চাইলে না হওয়ার কিছুই নেই। পুরোটাই ওর হাতে। তবু শেষ মুহূর্তে মনটাকে শক্ত করার চেষ্টা করল। ওর মতো ফ্লাইট রেকর্ড আর বিমান চালনার অভিজ্ঞতা খুব কম পাইলটেরই আছে। ও তিরিশ বছর প্লেন চালাচ্ছে। এত বছরে প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে গেছে। সব কিছুই এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়। তবু অভিজ্ঞ পাইলটের গুরুত্ব আজও একবিন্দু কমেনি। এখনও মানুষ-পাইলট না থাকলে সে প্লেনে লোকে উঠবে না।

একজন অভিজ্ঞ পাইলট যতটা নিখুঁতভাবে বিমান চালাতে পারে, ঠিক ততটাই বিপজ্জনক কিছুও ঘটাতে পারে। এটা নির্মাল্যর থেকে ভালো কেউ জানে না। আর তাই স্বয়ংক্রিয় সব ব্যবস্থা থাকলেও, সবধরনের সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও পাইলট চাইলেই আজও বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

ওর কবজিতে-পরা ঘড়িটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। মেসেজ আসছে। এবার এগোতে হবে প্লেনের দিকে। লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে প্লেনের দিকে যেতে যেতে ওর মনে পড়ল ছেলে সুমিতের কথা। মা না থাকায় বাবা আর মা দুজনের কাজই একা হাতে সামলেছে নির্মাল্য সুমিতের ছোটবেলায়। বন্ধু-বান্ধব এর সঙ্গে আড্ডা না মেরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সময় পেয়েছে তার পুরোটাই চিরকাল দিয়েছে ছেলেকে। তা সে-ছেলের সঙ্গেই গত পাঁচ বছর ওর একবারও দেখা হয়নি। মঙ্গলে যাওয়ার পর থেকে আর দেখা হয়নি। আগে তবু মাসে একবার ভিডিও ফোনে কথা হত। ইদানীং তারও আগ্রহ চলে গেছে। আসলে বহুদিন যোগাযোগ না থাকলে কথার মধ্যে প্রাণটাই যেন হারিয়ে যায়। মনে হয় শব্দগুলো মহাবিশ্বের শূন্যতার মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। দুদিন আগে নির্মাল্য খবর পেয়েছে সুমিত কর্মসূত্রে আরও দূরের গ্রহে চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে পৃথিবীতে আসতেই এক বছর লেগে যাবে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই সম্পর্কের এই দূরত্বগুলোকে মেনে নিয়েছে। অনেকের পরিবারই এই মহাবিশ্বে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে অত্যন্ত নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্কগুলোও অ্যালবামের ছবিগুলোর মতোই প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। নির্মাল্য কিন্তু এটা মেনে নিতে পারেনি। আর তাই মাঝেমধ্যেই আজও মনে হয় কী দরকার এই অর্থহীন জীবনের যেখানে কেউ এক মুহূর্তের জন্যেও নির্মাল্যকে নিয়ে ভাবে না। নির্মাল্য থাকলে বা না থাকলে কারোর কিছু এসে যায় না।

প্লেন ওড়ানোর সময় ঝড়ঝাপটা, খুব খারাপ আবহাওয়া হলে ওর সবার আগে মনে হত সুমিতের কী হবে। প্রত্যেক বার পারফেক্ট ল্যান্ডিং করার তাগিদের পিছনে এটাই ছিল মূল কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথায় যেন জীবনটা ওর কাছে পারফেক্ট হয়ে ওঠেনি। জীবনের আসল উদ্দেশ্যটাই কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

প্লেনের দিকে এগোতে গিয়ে নির্মাল্যর মনে হল একটু প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে বসা যাক। একটু দূরত্ব রেখে বসে হাতের তালুর প্যানেলের খবরকাগজটাতে চোখ বোলাল। মনটাকে একটু শান্ত করার জন্যে। কাউকে কিছু বুঝতে দেওয়া চলবে না। কিন্তু নাহ। মন বসল না। আসলে এ সব খবরের আর কোনও দরকার নেই নির্মাল্যর কাছে। কালকে ঠিক কোন জায়গায় থাকবে এ খবরটা! প্রথম পাতায় তো অবশ্যই। পথভ্রষ্ট ফ্লাইট ৩২ ধাক্কা মেরেছে আল্পসে। ১৩২ জন নিহত। সাম্প্রতিককালের সবথেকে বড় দুর্ঘটনা। প্রথম বার লোকে ভাববে পাইলট নির্মাল্যর কথা। আলোচনা হবে কী কারণে ২০৪০ সালের সবথেকে নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থাতে সবরকম সাবধানতা নেওয়া সত্ত্বেও দুর্ঘটনা থামানো সম্ভব নয়। প্রথম বার সবাই ভাববে পাইলট নির্মাল্যর পঞ্চাশ বছরের জীবনের একাকীত্বর কথা। ওর অকারণ অস্তিত্বের কথা।

একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল নির্মাল্য। চারদিকে ফ্লাইট ৩২-র প্যাসেঞ্জাররা বসে আছে। এরা জানেও না কিছুক্ষণের মধ্যে এদের ভাগ্যে কী হতে চলেছে!

আজকে সকালেই খবরটা পেয়েছে নির্মাল্য। আর মোটে ছয়মাস বাদে এক বিরল জেনেটিক রোগে ও ওর মস্তিষ্কের সক্ষমতা হারাতে চলেছে। ব্রেনের এই রোগে ওর পক্ষে আর প্লেন চালানো সম্ভব হবে না আর তিন মাস পর থেকে। আর ঠিক ছয় মাস পর থেকে ও কাউকে চিনতে পারবে না। সুমিতকেও না। রিপোর্ট পাওয়ার পর বিশ্বাস হয়নি। আবার ফোন করে কথা বলার পরে জেনেছে যে কোনও ভুল নেই। আর এই আসন্ন অসুস্থতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনও উপায়ও নেই। সুমিতকে জানালেও সুমিত এর মধ্যে পৃথিবীতে ফিরতে পারবে না। আর তাই জ্ঞানত একমাত্র আপনজনকেও সরাসরি দেখার কোনও উপায় নেই।

আর এই একই রোগ হয়তো সুমিতের মধ্যেও লুকিয়ে আছে। ও যেখানে চাকরি করে সেখানে লোকে জানতে পারলে ওর চাকরিও যেতে পারে। আর এখন ও মেডিক্যাল ইন্সিওরেন্সও পাবে না। ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলোর কাছেও এসব তথ্য থাকে। এত সহজে যে আজকাল একজন আরেকজনের সব তথ্য পেয়ে যেতে পারে, এটা সত্যিই কি খুব

ভালো? নিজের জন্যও কি ভালো? বিশেষ করে যেখানে এর সহজ কোনও সমাধান নেই। এই যে ও জেনেছে এতে ওর কিছু করার আছে? এর কোনও চিকিৎসা নেই। মৃত্যু শুধু এগিয়ে এসেছে আরও ছ'মাস।

চিন্তাভাবনাগুলো কিরকম যেন অবিন্যস্ত হয়ে আসছে। আর সময় যত যাচ্ছে, মৃত্যুর জেদটা যেন তত বাড়ছে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল নির্মাল্য। কেউ লক্ষ করছে না তো! অবশ্য লক্ষ করবে কী করে! ওর মনের এই অবস্থাটুকু জানা তো কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। একটু বাদেই ফ্লাইট বোর্ডিং চালু হবে। কাউন্টারের রোবট বিমানসেবিকা এসে গেছে। হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আর ঠিক দু-মিনিটের মধ্যে ফ্লাইটে ওঠার জন্য ডাকবে।

ফ্লাইট ছাড়ার ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে ফ্লাইট ৩২ আছড়ে পড়বে আল্পসের উপরে। অর্থাৎ আরও এক ঘণ্টা নিজের মনের ভাবটাকে কাউকে জানাতে দেওয়া চলবে না। নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অপরাধীকে আড়াল করে কেমন যেন আনন্দ পেল ও।

এর মধ্যে নির্মাল্য খেয়াল করল ওর ঠিক উলটো দিকে এক বছর পঁয়ত্রিশের ভদ্রলোক তার বছর আটেকের ছেলেকে নিয়ে বসেছে। ভদ্রলোক ছেলের সঙ্গে কথা বলছে আর কথা বলতে বলতে দুজনে মিলে একটা স্যান্ডউইচ ভাগ করে খাচ্ছে। ফ্লাইট ৩২-এর প্যাসেঞ্জার কি? এরকম দৃশ্য সত্যিই এখন দেখা যায় না। পরিবারগুলো কীরকম যেন ভেঙে গেছে। একসঙ্গে কখনও থাকলেও নিজেদের মধ্যে কথাই বলে না। এই যে সামনে এতজন বসে আছে, প্লেনের জন্য অপেক্ষা করছে, কেউ কারুর সঙ্গে কোনও কথা বলছে? সবাই যেন যন্ত্রের মতো হয়ে গেছে। কেউ হাতের তালুতে সিনেমা দেখছে তো কেউ মাথায় যন্ত্র পরে এক অন্য কৃত্রিম জগতের দুনিয়ায় হারিয়ে গেছে। সবথেকে দূরে তার সবথেকে কাছের মানুষ। মানুষ আজকে যন্ত্রের ভাষা বোঝে, কিন্তু অন্য আরেক মানুষের কথা বোঝা ভুলে গেছে। আর তাই তো আজ নির্মাল্য এত একা। ওর রাগ হয় এই সমাজের উপরে। অথচ কুড়ি বছর আগেও তো সমাজ এরকম ছিল না। মানুষ ভয় পেত রোবটদের। ভাবত কখন রোবট এসে তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেবে। কখন মানুষকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেবে। কিন্তু

নিজেরাই যে আস্তে আস্তে নিজেদের অজান্তে রোবট হয়ে উঠবে এটা তো আগে বোঝা যায়নি।

ভদ্রলোক ন্যাপকিন দিয়ে ছেলেটার মুখ মুছে দিচ্ছে। অজান্তে চোখে জল চলে এল নির্মাল্যর। কুড়ি বছর আগে ঠিক এভাবেই নিজের হাতে খাইয়ে দিত সুমিতকে। আর আজ! তাকে দেখতেই পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুমিতও যেন কেমন বদলে গেছে।

হাতের তালুর প্যানেলে খবরকাগজের লেখা শব্দগুলো যেন আবছা হয়ে যেতে লাগল। চোখের সামনে যেন ফুটে উঠল ছোটবেলার সুমিত। ওর সঙ্গে ফুটবল খেলা দিনগুলো। ওকে গল্প শোনানোর দিনগুলো। আকাশের দিকে দেখিয়ে মাকে খুঁজে বার করতে বলার দিনগুলো। ওর এই তারার পিছনে ছোটার নেশা ওখান থেকেই আসেনি তো? কে জানে?

সামনে থেকে কথা ভেসে আসছে। বাবা আর ছেলের মধ্যে কথা। প্রত্যেকটা শব্দ কত মূল্যবান। আর এই শব্দগুলোর সন্ধানেই তো এত বছর কাটিয়ে দিয়েছে নির্মাল্য। কখনও খুঁজে পায়নি। আজ হঠাৎ করে শেষ মুহূর্তে এদেরকে সামনে থেকে দেখা। হা ঈশ্বর! এখনও পৃথিবীতে প্রাণ আছে।

ফ্লাইট ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে। টিফিনবক্সটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওই অপরিচিত বাবা ও ছেলে। ঠিক যেন নির্মাল্য আর সুমিত। কুড়ি বছর আগের এক সকাল। কেউ যেন ঘড়ির কাঁটা হঠাৎ করে ঘুরিয়ে দিয়েছে। একবার নির্মাল্যর মনে হল ছুটে গিয়ে বারণ করে প্লেনে উঠতে। কিন্তু না। ওরা দ্রুত পায়ে রোবট বিমানসেবিকার পাশ দিয়ে জেনোম স্ক্যানার যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্লেনের দিকে এগিয়ে গেল। এখন জেনোম বা জিন সিকোয়েন্স ডেটাব্যাঙ্কের সঙ্গে মিলিয়ে তবেই কাউকে প্লেনে উঠতে দেওয়া হয়। একেবারে ১০০ শতাংশ নির্ভুল সনাক্তকরণ। ভুল হওয়ার কোনও চান্সই নেই। একইসঙ্গে পাসপোর্ট—ভিসার বালাই নেই। পুরোটাই অটোম্যাটিক হয়। তাই সময়ও লাগে না, আর একইসঙ্গে প্রত্যেক যাত্রীর যাবতীয় তথ্য খুব সহজেই আগে থেকে দেখে নেওয়া যায়। কোনও টেররিস্টের পক্ষে কিছু ঘটনা ঘটানো এখন প্রায় অসম্ভব। তার পক্ষে বিমানবন্দরের কাছে পিঠে আসাও সম্ভব নয়।

নির্মাল্যর হাতের তালুতে এবার মেসেজ এসে গেছে। ওকে এবার প্লেনে উঠতে হবে। নাহ, ওর পক্ষে আর আগের প্ল্যান মতো এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীটা এখনও এত খারাপ হয়ে ওঠেনি।

আর ভাগ্যে যা আছে, তাকে তো স্বীকার করতেই হবে। এর থেকে পালিয়ে বেড়ানোর কিছু নেই। এখনও তো ছ'মাস আছে সময়। কত কিছুই করা যায় এই ছয় মাসে।

ও এগিয়ে গেল বিমান সেবিকার পাশ দিয়ে প্লেনে ওঠার জন্য। পাইলটের হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে।

হঠাৎ একজন সুদর্শন রোবট ওর দিকে এগিয়ে এলো।

—স্যার, আপনি আজকে প্লেন চালাতে পারবেন না। আপনি প্যাসেঞ্জার হিসেবে প্লেনে উঠতে পারেন।

—কেন? আমার তো আজকে প্লেন চালানোর কথা। আমি পাইলট।

—আমরা জানি স্যার। কিন্তু আমরা আপনাকে আজকে প্লেন চালানোর অনুমতি দিতে পারছি না।

—কেন? আমার মতো সিনিয়র পাইলটকে থামানোর অধিকার তোমায় কে দিয়েছে?

—স্যার, আমরা দুঃখিত। একটু বুঝিয়ে বলছি। আপনি বোধহয় জানেন না যে আমরা আপনাদের উপরে চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখি। আপনি যে আজকে আপনার অসুখ সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন এটা আমাদের অজানা নয়। এমনকী আজকে যে আপনি ব্রেকফাস্টে নিয়মিত খাবার খাননি, বেরোনোর সময় বাইরের দরজা বন্ধ করেননি, তাও আমরা জানি। এও জানি যে ছেলের জন্য আপনার লেখা ডায়েরি আর ওর ছোটবেলায় প্রত্যেকবারে জন্মদিনে উপহার দেওয়া নিজের হাতে আঁকা ছবিগুলোও গুছিয়ে রেখে এসেছেন।

একটু থেমে রোবটটা ফের বলে উঠল—আর যাদের আপনি লক্ষ করছিলেন, তারা আমাদের পরীক্ষারই অঙ্গ ছিল। দুজনেই হিউম্যান অ্যাক্টর। অভিনেতা। আপনার মনোভাবে কোনও পরিবর্তন হয় কিনা তাই লক্ষ করছিলাম। আপনার ব্রেনওয়েভ দেখে আমরা এখনও নিশ্চিত নই যে আপনি বিপজ্জনক নন। তাই আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

—হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি। আমি খানিকক্ষণের জন্য অন্যরকম ভাবছিলাম। কিন্তু এখন আর তা ভাবছি না। এ প্লেনে দুর্ঘটনা ঘটানোর কোনও ইচ্ছে আর আমার নেই।

মুচকি হেসে রোবটটা বলে ওঠে—শুধু আমরাই নই। আমরা প্যাসেঞ্জারদের আপনার কথা জানিয়ে তাদের মতামত চেয়েছিলাম। প্যাসেঞ্জাররাও জানিয়েছে যে তারা আপনার থেকে একটা রোবট পাইলটকে অনেক বেশি বিশ্বাস করে। এই দেখুন। ১৩২ জনের মধ্যে ১৩২ জনই এ বিষয়ে তাদের অভিমত জানিয়েছে। আপনার বিরুদ্ধে। আর তাই আপনার পাইলটের লাইসেন্স ক্যান্সেল করার কথাটা আমরা 'হিউম্যান পাইলট ট্রেড ইউনিয়ন'-কে এই কিছুক্ষণ আগেই জানিয়েছি।

একটু থেমে রোবটটা আবার বলে উঠল—আমরা সত্যি দুঃখিত। কিন্তু কী করব বলুন মানুষরাই আপনাদের থেকে রোবটদের উপরে আজকাল বেশি বিশ্বাস করে। আমরা কখনো ভুল কাজ করি না। কিন্তু আপনাদের বোঝা মুশকিল। আপনারা বড় জটিল। কখন যে কী করে বসবেন তা রোবটের পক্ষেও বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।



সময় যখন চারটে চল্লিশ

তা এখানে এত বছর কেউ থাকত না?

—না। ঠিক ছমাস আগে সবার জন্য এই ক্যাসল খোলা হয়। তার আগে প্রায় সত্তর বছর এখানে কেউ থাকত না। ক্যাসলের যা অবস্থা হয়েছিল, তাতে বড় ধরনের খরচ না করলে কিছু করা যাচ্ছিল না। শেষে ওয়েলস সরকার থেকে এটা খানিকটা ঠিকঠাক করে সবার জন্য খোলার সিদ্ধান্ত নেয়।

—তা এত ভালো জায়গায় ক্যাসল, আর কেউ থাকত না?

—যেরকম বদনাম ছিল এ ক্যাসলের, তাতে কে থাকবে এখানে?

—বদনাম? কীসের বদনাম?

—কীসের আর বদনাম হতে পারে! ভূতের। বেশিরভাগ ক্যাসলের সঙ্গেই অনেক ভৌতিক ঘটনা জড়িয়ে থাকে। কিন্তু এটার সঙ্গে ভূতের

যোগাযোগ এতটাই যে আর্মিও ভয় পেয়ে যায়। ১৮৭০ সালে এই ক্যাসলকে প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহার করার কথা হয়েছিল। ওয়েলসের পশ্চিম সীমান্তকে ফ্রান্সের আক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখতে। কিন্তু তারপরে এই ক্যাসলের দুর্নামের জন্য এটাকে আর্মি ব্যবহার করতে রাজি হয়নি।

একটু থেমে স্পর্শ আবার অভীককে বলে উঠল—আর এটা কবেকার ক্যাসল জানিস? হাজার বছরের থেকেও বেশি পুরোনো। ওয়েলসকে সুরক্ষিত করার জন্য এটা তৈরি করা হয়েছিল। তখনকার দিনে সমুদ্র দিয়ে দরকারি জিনিসপত্র আসত। ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি২ যখন ওয়েলস আক্রমণ করেন, তখন ওয়েলসের নেতা রাইস এ দূর্গের সাহায্যেই সে আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।

ওয়েলসকে ইংল্যান্ডের হাত থেকে বাঁচাতে যে-ক'টা ক্যাসল বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল, এটা তার মধ্যে একটা।

—বলিস কী? তাহলে এঁকে তো রীতিমতো ঐতিহাসিক ক্যাসল বলতে হবে।

—শুধু শুধু কি আর তোকে এটা দেখাতে নিয়ে এসেছি! কবেকার কথা! আর এ ক্যাসল আক্রমণ করা কত শক্ত সেটাও ভাব। কী স্ট্রাটেজিক পজিশন! সমুদ্রের মধ্যে জেগে আছে একটা খাড়া পাহাড় আর তার উপরে এই ক্যাসল। যে-কোনওদিকে পাঁচ-ছ'মাইল অনায়াসে দেখা যায়। আর ল্যান্ডের দিক দিয়ে আক্রমণ করার একমাত্র উপায় হল টেনবীর দিক দিয়ে আসা। এক দিক সামলালেই হল। আর সেদিক দিয়েও সমুদ্র পেরিয়ে তবেই আসতে হবে।

—তা এটা তো এত পুরোনো ক্যাসল মনে হয় না?

—ক্যাসলের একদম বাইরের যে উঁচু পাথরের দেওয়াল, টাওয়ারগুলো দেখলি, সমুদ্রের উপর দিয়ে যে কাঠের ব্রিজটা দেখলি সেগুলো সব আগেকার অবস্থাতেই আছে। পরে ভেতরের থাকার ঘরগুলো, রান্নাঘর, হলঘরগুলো মেরামত করে নেওয়া হয়। তবু এখানে অনেক ঘর আছে যা এখনও মেরামত করা হয়নি। সেরকমই শুনেছি।

—তা ভূতের যে ব্যাপারটা বললি সেটা কীরকম?

—বলছি। কিছুদিন আগে খোলার পরপর এখানে একটা ঘোস্ট ট্রিপও চালু হয়েছিল। এটা অনেক ক্যাসলেই করা হয়। রাতের অন্ধকারে টর্চের লাইটে ক্যাসল দেখানো আর অতীতের ভূতের গল্পকে আরও বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলা আর কি! কিন্তু এখানে সে ট্রিপও বন্ধ হয়ে গেল।

—কারণ?

—ঠিকভাবে না জানা গেলেও শোনা গেছে যে অনেকেই এখানে ঘোস্ট ট্রিপে এসে ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। রাতে নাকি ট্রিপ চলাকালীন নানান ধরনের আওয়াজ শোনা যেত। তারপরে হঠাৎ করে ছায়ার মতো কাউকে ক্যাসলের লাইব্রেরিতে দেখাও গিয়েছিল। একজন দর্শক তো এরকম একটা ছায়াকে শো-এর অংশ ভেবে কথা বলতে এগিয়ে গিয়েছিল। পরে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধরণের আর কি! তা সে কথা ছাড়। এবার একটু পা চালিয়ে দেখা যাক। আর এক ঘণ্টার মধ্যে ক্যাসল বন্ধ হয়ে যাবে। সমুদ্রের জলে ডুবে যাবে মাঝের রাস্তা। দেখলি না তাই ঢোকার সময় ওয়ার্নিং ছিল সব জায়গায় লেখা। পুরো রাত এখানে আটকে থাকতে হবে। অবশ্য, ওরা এসব ব্যাপারে খুব সজাগ। আমাদের ঠিক তার আগে বার করে দেবে।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। এখনও অনেকগুলো ঘর বাকি। তিনটে তলা দেখেছি। এর উপরে তো আরও একটা তলা আছে। তাড়াতাড়ি দেখা যাক। জানিস তো—বলতে গিয়েও থেমে গেল অভীক। ওরা দুজনে প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে আরেকটা ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

অভীক আর স্পর্শ দুজনে মিলে ওয়েলসের টেনবীর একটা ক্যাসল দেখতে এসেছে। স্পর্শ ইংল্যান্ডেই থাকে। অভীক কিছুদিনের জন্য অফিসের কাজে ইংল্যান্ডে এসেছে। তা দুজনে মিলে প্ল্যান করে এই টেনবী ক্যাসল দেখতে এসেছে। ওয়েলসের পশ্চিম সীমান্তে। লন্ডন থেকে পাঁচ ঘণ্টার পথ। টেনবী সমুদ্রের ধারের খুব পুরোনো শহর। ভারী সুন্দর বীচও আছে। আর তাই দেখতে বহু দূর দূর থেকে লোক আসে। এই শহরের নতুন আকর্ষণ এই ক্যাসল। ক্যাসলের সবথেকে অভিনবত্ব হল এর অবস্থান।

বীচ থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে সমুদ্রের উপরে জেগে থাকা একটা পাহাড়ের উপরে ক্যাসলটা তৈরি করা হয়েছিল। মাঝের পথটা দিনের বেশিরভাগ সময়ে সমুদ্রের তলায় থাকে। শুধু খানিকক্ষণের জন্য যাওয়া যায়।

তা এসব ভাবতে ভাবতে অভীক একটু পিছিয়ে পড়ছিল। স্পর্শ বলে উঠল—কি রে বারবার থেমে যাচ্ছিস যে!

—আমি শিওর এখানে আগে এসেছি। যেন স্বপ্নে দেখেছি।

—মানে?

—তোকে আগেই বলব ভাবছিলাম। কিন্তু তুই বিশ্বাস করবি না বলে আগে বলিনি। এই—এই যে ঘরটাতে এসেছি এখন, এখানে যেন কতবার আগে এসেছি। ওই যে দেওয়ালে লতা পাতা ফুল আঁকা, তাও কতদিন দেখেছি। দেওয়ালের রং যদিও একটু আলাদা ছিল মনে হয়। এরকম সবুজ ছিল না। দেওয়ালে লাগানো পোট্রেট ছবিগুলোও যেন চেনা। পায়ের নীচের সেই একই রকম লাল-কালো চৌকো টাইল। আর্চ করা বিশাল বড় বড় জানলা। জানলার কাছে পাথর দিয়ে বেঞ্চের মতো বসার জায়গা। ঘরের ছাদে কাঠের কাজ। কাঠের দেরাজের মধ্যে বেসিন। সব দেখেছি। কতবার দেখেছি।

—এরকম অনেক সময় হয় বুঝলি। আমারও হয়। একে বলে ‘Déjà vu’, আসলে ছোটবেলা থেকে আমরা এত গল্পে এরকম ক্যাসলের কথা পড়েছি যে মনে সেটাই রয়ে গেছে।

—নারে সেরকম নয়। এ যেন অনেক বেশি স্পষ্ট।

বলতে বলতে ওরা আরেকটা বিশাল ঘরে এসে পৌঁছেছে। এটা গোল ঘর। আগেরটার থেকেও বেশি রংচঙে। দেওয়ালে বাচ্চাদের গল্পের ছবি আঁকা।

অভীক আস্তে আস্তে বলে উঠল—এটাই ওই বাচ্চা মেয়েটার ঘর ছিল। ওই যে ওর খাটটা। কি সুন্দর নকশা করা দেখেছিস! সবুজ কাঠের আলমারি। জানলার ওখানটাতে পাথরের উপরে বসে বাইরের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকত বেশিরভাগ সময়।

—কে?

—জানি না। কিন্তু এ ঘরের ছবিটা যখনই মনে পড়ে, তখনই তার সঙ্গে ওই মেয়েটার ছবিও মনে পড়ে।

—কী সব বলছিস? দাঁড়া জিজ্ঞাসা করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ ঘরটাতে কে থাকত তা একটু জিজ্ঞাসা করে আসি।

বলে স্পর্শ কাউকে ডাকতে চলে গেল। খানিকবাদে ক্যাসলের রক্ষণাবেক্ষণের একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে এল। জিগ্যেস করতে এই ঘরটা সম্বন্ধে লোকটা যা জানাল তা হল, এটা ছিল ক্যাসলের বাচ্চাদের ঘর। এখানেই থাকতেন বিউট ফ্যামিলির ছোট মেয়ে অ্যালিস। একদিন হঠাৎ করে হারিয়ে যায় অ্যালিস। সেই ছিল বিউট ফ্যামিলির শেষ সদস্য। তারপর থেকেই যেন এ ক্যাসলের ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা আরও বেড়ে যায়।

—দেখলি যা বলেছিলাম।—স্পর্শকে লক্ষ্য করে অভীক বলে উঠল। তারপরে লোকটাকে জিগ্যেস করে উঠল—তা ওরা কবে এখানে ছিল?

লোকটা ফের বলে উঠল—১৫০০ থেকে ১৮৫০ সাল অব্দি এ ক্যাসলে থাকত বিউট ফ্যামিলি। তখনকার বিল গেট্স। পৃথিবীর সবথেকে ধনীদের মধ্যে প্রথম দিকে ছিল বিউট ফ্যামিলি। কার্ডিফ ক্যাসলও ওদের। অনেক সোনা, তামা, কয়লাখনি ওদের ছিল। তা এ ক্যাসল রক্ষণাবেক্ষণের কাজেও প্রায় ৩০০ জন ক্রীতদাস কাজ করত। শেষের দিকে একটা অদ্ভুত ঘটনা এখানে শুরু হয়েছিল। অনেক ক্রীতদাস কী করে জানি এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। তা অ্যালিসের বয়স যখন বারো, হঠাৎ করে একদিন হারিয়ে যায়। খুব গুণী মেয়ে ছিল শুনেছি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তা ওর হারিয়ে যাওয়ার পরেই বিউটরা এখান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কার্ডিফ ক্যাসলে চলে যায়। আর এই ক্যাসলের গৌরবের দিনও সেখানেই শেষ।

স্পর্শ ফের জিজ্ঞাসা করে উঠল—তা তার পরে এখানে আর কেউ থাকেনি?

—তার পরে আরও অনেক ফ্যামিলি এখানে এসেছে। কিন্তু কেউই বেশি দিন থাকতে পারেনি। তখন থেকেই এখানে ভূতের উৎপাত।—

লোকটা একটু থেমে ফের বলে উঠল —আসলে এসব ক্যাসলে এত অত্যাচার হয়েছে ভাবা যায় না। বিউটরাও খুব অত্যাচারী ছিল। ছোট ছোট অপরাধে কড়া শাস্তি দেওয়া হত। শুনেছি এ ক্যাসলে অনেক গুপ্তঘর ছিল। যে-কোনও অপরাধ করলে ক্রীতদাসদের সেখানে ফেলে দেওয়া হত। তা ছোটখাটো চুরিই হোক, কি খারাপ রান্না, কি খারাপ ভাবে কোনও কাজ করা। সামান্য দোষে শাস্তি হত প্রাণদণ্ড।

লোকটা যাওয়ার আগে বলে উঠল—আর খানিকক্ষণের মধ্যেই ক্যাসল বন্ধ করে দেওয়া হবে। লাইব্রেরিটা তাড়াতাড়ি দেখে নিও। অত বড় লাইব্রেরি খুব কম জায়গাতেই দেখবে।

লোকটা চলে যাওয়ার পরে অভীক বলে উঠল—দেখলি যা বলছিলাম। ওই মেয়েটাকেই আমি দেখেছি। অ্যালিসকে।

স্পর্শ ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল—ধুর। এটা যে বাচ্চাদের ঘর তা দেখেই বোঝা যায়। এটা আবার বলার কী আছে। তা তুই যাকে দেখতিস তার বর্ণনা দে।

—বছর ১২-১৩ হবে। সোনালি কোঁকড়ানো চুল। নীল রঙের চোখের মণি। চোখ দুটো বড় বড়। খুব সুন্দর। সব সময় মুখে হাসি।

—আর কী মনে পড়ে?

—একটা লোক ছিল। যখন সে রেগে যেত, সবাইকে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ফেলে দিত।

—ও যেই লোকটা বলে গেল, তোর তখনই মনে হল। আচ্ছা, বল তো এ ঘরটার পরে কোন ঘর আসবে?

—আমার অত কিছু মনে নেই। শুধু দেখলে পরে মনে হচ্ছে যেন আগে দেখেছি। আর তার সঙ্গে আরও কিছু কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমার কথায় তোর বিশ্বাস করার কোন দরকার নেই। তবে আমিও জানি আমি এখানে আগেও এসেছি।

—আচ্ছা, তুই ছিলিস লাস্ট বিউট।—বলে হেসে স্পর্শ বলে উঠল—তা ঘরের মধ্যের কাঠের খাটটা দেখেছিস। কি সুন্দর কাজ দেখেছিস! এরকম একটা খাটেরই কত দাম হবে এখন কে জানে?—বলে স্পর্শ ছবি

তুলতে এগিয়ে গেল।

এটাই স্পর্শের একটা দোষ। যেখানেই যাবে এত ছবি তুলবে, মনে হয় যেন লেন্সের চোখেই সে জায়গাটা দেখে।

অভীকের মনে হল দাঁড়িয়ে না থেকে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখে। ঘরটা থেকে বেরিয়ে আরেকটা বড় ঘর। আগের ঘরগুলোর মতো অতটা সাজানো না। লাল আর সাদা রং করা। মনে হয় মেয়েটার দেখাশোনার জন্য যে মহিলা থাকত এটা তারই ঘর। ঘরটার শেষ প্রান্তে একটা সরু প্যাসেজ। সেটার শেষ প্রান্তে মেশিন রুম। এই মেশিন রুম থেকেই ক্যাসলে ঢোকার ব্রিজটা ওঠানো-নামানো হত আগে। কেউ আক্রমণ করলে মাঝের বিশাল কাঠের ব্রিজটা তুলে নেওয়া হত। শত্রুসেনাকে তখন মাঝের সমুদ্র পেরিয়ে আসতে হত।

ক্যাসলের নিরাপত্তা দুই স্তরের। বাইরের দেওয়াল আর টাওয়ারের বাধা পেরিয়ে ঢুকে পড়লে তখন তাদের এই ব্রিজ পেরিয়ে আসতে হত। আর তখন তাদের এই ভেতরের দেওয়ালের ছোট সরু সরু অনেক ফোকর থেকে আক্রমণ করা হত। এখান থেকেই তিরন্দাজরা তির ছুড়ে তখন দূর্গ রক্ষার চেষ্টা করত। পরের দিকে অবশ্য বন্দুক, কামান সবই বসানোর ব্যবস্থা হয়েছিল।

মেশিন রুমটার শেষের দিকে বাঁ দিকে একটা সরু সিঁড়ি ক্যাসলের দেওয়ালের ধার দিয়ে উপরে উঠে গেছে। কিন্তু সিঁড়ির মুখেই পথটা দড়ি দিয়ে বন্ধ করা আছে। ক্যাসলের মধ্যে অন্য পথ আছে যা দিয়ে উপরে ওঠা যায়। এই সিঁড়ির পথটা এখনও সারানো হয়নি। সিঁড়ির নীচে সাবধানবাণীও দেওয়া আছে, অন্য পথ ব্যবহার করার। তবে উঁকি মারলেই ক্যাসলের আগের রূপটা টের পাওয়া যায়। সেই হাজার বছর আগের পাথরের কঙ্কাল। আলো না থাকায় আর সিঁড়িটা ঘুরে যাওয়ায় অবশ্য কয়েকটা সিঁড়ির বেশি দেখা যাচ্ছে না।

ফিরেই আসছিল অভীক। হঠাৎ কী মনে হতে ফের এগিয়ে গেল সিঁড়িটার দিকে।

আচ্ছা, এখানেই সে লোকটাকে ও দেখত না! একটা ঘরের কোণে

দাঁড়িয়ে থাকতে। আর যখন রেগে যেত, তখন সবাইকে ফেলে দিত অন্ধকার ঘরে। কেন জানে না, আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। আশপাশ দেখে ও এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। কেউ নেই। আস্তে করে দড়ি টপকে সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে উঠে গেল। কয়েকটা সিঁড়ি যেতেই চারদিক থেকে অন্ধকারটা গাঢ় হয়ে এল। কোনও আলো নেই। খাড়া সিঁড়ি।

পাথরের দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে খানিকটা উঠতেই ডান দিকে একটা ঘর পড়ল। ঘরে ঢোকার বিশাল কাঠের দরজাটা বন্ধ। দরজাটা ভাঙাচোরা অবস্থায় কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়িটা আরও উপরে উঠে গেছে। ওর মন বলে উঠল এ ঘরটাতেই সব রহস্য লুকিয়ে আছে। ও অনেক চেষ্টার পরে দরজাটা একটু ফাঁক হতে তার মধ্যে দিয়ে কোনওরকমে ঘরটার মধ্যে ঢুকল। ঢুকতে গিয়েই ও একটা অন্যরকম গন্ধ পেল। তীব্র পচা কিছুর গন্ধ। তবু সেটা অগ্রাহ্য করে ও ঘরের আরও ভিতরে ঢুকে গেল।

চোখটা ধাতস্থ হয়ে আসতে খেয়াল করল ও একটা বিশাল বড় গোল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এখনকার দশটা ঘর অনায়াসে এ ঘরের মধ্যেই ঢুকে যায়। ঘরটার দেওয়াল জুড়ে বেশ কয়েকটা কাচের জানলা। কিন্তু দীর্ঘ দিন পরিষ্কার না করায় জানলাগুলো দিয়ে অতটা আলো আসছে না। ঘরটার সিলিং বেশ উঁচু। ঘরের উপরের দিকে ঘরের মধ্যেই একটা কাঠের ঘোরানো বারান্দা। ঘরের মাঝে একটা বহু পুরোনো বিশাল বড় গোল টেবিল। তার উপরের ছাদে গ্রহ, নক্ষত্রের ছবি আঁকা। এখানে যেন অনেকে মিলে বসে আলোচনা করত। আর মৃত্যুর পরে কী হয়, পৃথিবী, মহাবিশ্বের সঙ্গে কী তার সম্পর্ক এসব নিয়ে গবেষণা করত। হ্যাঁ, এ ঘরটাও খুব চেনা। আচ্ছা, এখানেই সেই লোকটা থাকত না, যে রেগে গেলে অপরাধীকে অন্ধকার ঘরে ফেলে দেওয়া হত।

কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে একটা বিশাল গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক আর কিছু ভাঙা টেবিল ছাড়া আর কোনও কিছু চোখে পড়ল না। ওর নিজেরই অবাক লাগল এত ভালো একটা ঘরকে কেন সাধারণ দর্শকদের থেকে আড়ালে রাখা হয়েছে। ভালো করে দেখতে ঘড়িটার দিকে এগিয়ে গেল অভীক। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট উচ্চতার কাঠের ঘড়ি। ঘড়িটা আশ্চর্যজনকভাবে

এখনও চলছে। মিনিট আর ঘণ্টার কাঁটা দুটো ঘুরে ঘুরে চলেছে। এত কারুকাজ করা ঘড়ি ও খুব কমই দেখেছে। রোমান অক্ষরে সংখ্যাগুলো লেখা। ঘড়ির দশটা, দুটো আর ছ'টার জায়গায় তিনটে বড় বড় কালো গোল। কী অদ্ভুত দেখতে ঘড়িটা। নীচে কাচে ঢাকা বাক্সে বিশাল পেন্ডুলাম দুলে চলেছে।

ও চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেল। ঘড়িটা যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। দুটো গোল গোল কালো চোখে যেন ওকে লক্ষ করছে। সে দৃষ্টি এমন যে তাকে উপেক্ষা করে চলে যাওয়ার উপায় নেই। আর অন্য কালো গোলটাকে ঠোঁটের মতো লাগছে। ও অবাক হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

ঘড়ির কাঁটা যেন একটা রহস্যের জালে ওকে বেঁধে ফেলেছে। এখন সাড়ে চারটে। মুখটা যেন খানিকটা অবাকভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। আর সময় যত যাচ্ছে, মিনিটের কাঁটাটা যত ঘুরছে ৩০-এর থেকে ৪০-এর দিকে যত যাচ্ছে, তত যেন রাগ রাগ ভাবটা মুখের মধ্যে ফুটে উঠছে। ও অবাক হয়ে অপেক্ষায় থাকল ৪টে চল্লিশের। ঠিক তখনই ঘড়িটাতে সেই রাগি লোকটার মুখটা ফুটে উঠবে। ঠিক তাই। খানিক বাদেই ঘড়িতে মিনিট আর ঘণ্টার কাঁটা দুটো এমন জায়গায় এল যে ওর মনে হল ঠিক যেন একজন লম্বা চওড়া রাগি লোক ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ, একেই ও বহুবার দেখেছে। এই সেই চেনা মুখ। ভয়ে অজান্তে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল। আর একইসঙ্গে ও টের পেল ওর পায়ের নীচের পাথরটা সরে যাচ্ছে। কিছু করার আগেই বুঝল ও অনেক নীচের দিকে পড়তে শুরু করেছে।

জ্ঞান যখন ফিরল, তখন চারদিকে তাকিয়ে অভীকের মনে হল ও অন্ধ হয়ে গেছে। চারদিকে এত ঘন অন্ধকার ও আগে কোনওদিন দেখেনি। চোখ খোলা আর বন্ধের মধ্যে কোনও তফাত নেই। দমবন্ধ করা পরিবেশ। আশেপাশে হাত দিয়ে হাতড়ে বুঝল ও বালির উপরে এসে পড়েছে। সারা গায়ে ব্যথা হলেও তাই বড় ধরনের কোনও চোট পায়নি। হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে গেল ও। একটা শক্ত পাথরের মতো কিছু একটা হাতে

লাগল। হাতে নিয়ে পাথরের উপরে হাত বোলাতেই টের পেল যে এটা পাথর নয়, এটা কারুর কঙ্কালের হাতের একটা অংশ। ভয়ে ছুড়ে ফেলে কোনওরকমে ও উঠে দাঁড়াল। এ ঘরে ও আগে এসেছে। বহুবার স্বপ্নে এই ঘরের অন্ধকারকেই ও দেখেছে। বহুবার দেখেছে তাদের, যারা বারবার চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ধরেছে। তবু মনের সব জোর এক করে ছোট ছোট পা ফেলে এগোতেই টের পেল ঘরটা কঙ্কালের টুকরোয় ভর্তি। যে দিকেই এগোয় পা কঙ্কালের টুকরোর উপরে এসে পড়ে।

তাহলে এটাই সেই ঘর যেখানে কোনও ধরনের অপরাধ করলে এ ক্যাসলের ক্রীতদাসদের ফেলে দেওয়া হত। আর খিদে-তেষ্টায় তিলে তিলে মৃত্যু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসত। আস্তে আস্তে। হয়তো মৃত্যু যখন আসত, তখন সে আর স্বাভাবিক থাকত না। টের পেত না, কারণ এই পরিবেশে কারোর পক্ষেই বেশিক্ষণ স্বাভাবিক থাকা সম্ভব নয়।

ভয়ে চিৎকার করে উঠল অভীক। কেউ কি শুনতে পাবে? কিন্তু এ ছাড়া তো অন্য কোনও উপায় নেই। যদি কেউ শুনতে পায় ও আবার চিৎকার করে উঠল। বারবার। খানিক বাদে টের পেল ওর গলা থেকে আর আওয়াজ বেরোচ্ছে না। তা হলে ওর জীবনের শেষ কি এখানেই? জলতেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। অক্সিজেনের অভাবে বুদ্ধিও যেন আর কাজ করছে না।

এ ঘরের খোঁজ কেউ নিশ্চয়ই জানে না। কে আর জানবে ঠিক একটা নির্দিষ্ট সময়েই একটা বন্ধ ঘরে গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক এর সামনের পাথরের মেঝে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য সরে যায় আর তার মধ্যে দিয়ে অপরাধীকে ফেলে দেওয়া হয় গুপ্তঘরে। নিশ্চয়ই কোনও গোপন লিভার আছে যেটা ঘড়ির কাঁটাগুলো ঠিক ওই অবস্থানে এলে সক্রিয় হয় আর ঘড়ির সামনের মেঝের পাথরটাকে সরিয়ে দেয়। ও আবার বসে পড়ল। মানুষ কত দিন জল না খেয়ে থাকতে পারে! একদিন-দুদিন-একমাস! আস্তে আস্তে ও এদের মতোই হয়ে পড়বে। শুধু কঙ্কাল। আর তাতে লেখা থাকবে না ওর পরিচয়।

মাথাটা একটু শান্ত করার চেষ্টা করল অভীক। স্পর্শ নিশ্চয়ই এতক্ষণে

খবর দিয়েছে ওর উধাও হওয়ার ব্যাপারটা। লোকেও নিশ্চয়ই খোঁজা শুরু করেছে। সেটাই শেষ আশা।

ফোন—ফোনটা কোথায়? হা ঈশ্বর! বারবার কল আসছিল বলে ওটাকে আজকেই গাড়িতে ব্যাগে রেখে এসেছে। অবশ্য এখানে নেটওয়ার্ক থাকত কিনা কে জানে?

এভাবে কতক্ষণ বসে ছিল কে জানে! হাঁটুর উপরে মাথা দিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিল। স্বপ্নে দেখল—একটা ছেলে বেশ কয়েকটা দামি ভারী সুন্দর পোরসেলিনের থালা নিয়ে খাবার টেবিলে সাজিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ হাত ফসকে একটা প্লেট হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। সেটা ধরতে গিয়ে বাকিগুলোও হাত থেকে পড়ে গেল। উলটো দিকে টেবিলে বসে থাকা ওরই বয়সি একটা মেয়ে হাসছে। কিন্তু টেবিলে বসা একজন সাহেব হান্টার বেল্ট নিয়ে ছেলেটার দিকে এগিয়ে এলো। মেয়েটা ছেলেটার দিকে এখন তাকিয়ে আছে করুণ চোখে।

চমকে উঠল অভীক। ঘুমের যে সামান্য ঘোর এসেছিল সেটা ভেঙে গেছে। স্বপ্ন। কিন্তু বাস্তবের থেকে সত্যি। অন্ধকারটা একইরকম রয়েছে। একটা অজানা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল অভীক। না, এখানকার চিৎকার কোনওদিনই সভ্য জগতের কানে যায়নি। যুগ যুগ ধরে এখানে শব্দ আর প্রাণ শুধু কঙ্কালে মিলিয়ে গেছে। ওরও তাই হতে চলেছে। তবু যত কম শক্তি খরচ করে যত বেশিক্ষণ বেঁচে থাকা যায়। খিদের থেকেও বেশি পেয়েছে জলতেষ্টা। তার থেকেও বেশি যেন বাতাসে অক্সিজেনের অভাব। আর তাই নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। আর যত ভয় পাচ্ছে, কষ্টটাও তত বাড়ছে। কানের কাছে কে যেন গেয়ে যাচ্ছে ওর প্রিয় গান—যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিভে যায় বারে বারে।

আরও বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার অভীক সারা ঘরটা ঘুরে বাইরে যাওয়ার কোনও উপায় আছে কিনা সেটার খোঁজ করেছে। কিন্তু না। চারদিকে নিরেট পাথরের দেওয়াল। কোনও দরজা নেই। কোনও ছোট জানলাও নেই। তবে হাতের নাগালের বাইরে উপরে কোনও কিছু থাকলে সেটা জানার কোনও উপায় নেই। চারদিকে কঙ্কালের স্তূপ।

আরেকটা জিনিস ও ইতিমধ্যে বুঝেছে, এ ঘরটাও ওর পরিচিত। অনেক আগেও যেন ওর সঙ্গে এরকম হয়েছে।

যত সময় যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কে যেন অজানা মন্ত্রে ঘরের কঙ্কালগুলোকে প্রাণ দিচ্ছে। আর তাই এখন কীসের যেন শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই—এই বুঝি ওর ঘাড়ে হাত রাখল কেউ।

হঠাৎ ওর মনে হল ঘরের উপরের দেওয়ালের উপর দিক থেকে যেন সামান্য আলো আসছে। আর একঝলক তাজা ঠান্ডা হাওয়া। একটা ফাঁক থেকে কে যেন একটা দড়ি নামিয়ে দিয়েছে। তাহলে কি ওরা খোঁজ পেয়েছে? উত্তেজনায় ও কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে টলমল পায়ে এগিয়ে গেল দড়িটার দিকে। তার পরে কোনওরকমে দুর্বল শরীরে দড়ি বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করল।

অনেক কষ্টে কোনওরকমে দেওয়ালের একটা ছোট ফাঁক থেকে মাথা গলিয়ে বেরিয়ে এল। বাইরে কেউ নেই। দড়িটা সামনে একটা পাথরে বাঁধা। ভারী অবাক হল চারদিকে দেখে। দূরে সেই আকাশ। সেই তারা ভরা আকাশ দেখে এত আনন্দ ও কোনওদিন আগে পায়নি। ক্যাসলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এসে পড়েছে একটা গুহার মধ্যে। শুনেছিল ক্যাসলটা যে পাহাড়ের উপরে, সে পাহাড়ের নীচে একটা গুহা আছে। ও সেই গুহার মধ্যেই এসে উঠেছে। গুহার মধ্যেও জল জমে আছে। মাঝে মধ্যে নিশ্চয়ই এটাও জলের তলায় চলে যায়। কিন্তু দড়িটা নামাল কে? কে ওকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে? কই, কেউ নেই তো কাছাকাছি।

বাইরে চাঁদের আলো। মাঝরাত। একটু খেয়াল করতে তার মধ্যেই দেখতে পেল একটা বছর বারো-তেরোর মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে খানিক দূরে। সমুদ্রের দিকে মুখ করে। রোগা লম্বা ছিপছিপে চেহারা। পরনে একটা দামি ফ্রক। পিছন থেকে শুধু দেখা যাচ্ছে ওর সোনালি কোমর অব্দি চুল। হাওয়ায় উড়ছে। গুহার সামনে সমুদ্রের ধারে একটা বোট লাগানো আছে। মেয়েটা বোটে গিয়ে উঠল। ও কোনওকিছু না ভেবে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মেয়েটার পিছু পিছু বোটে গিয়ে উঠল। মেয়েটা ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। নিপুণ হাতে বোট চালাতে শুরু করল। কাছের তীরের দিকে নয়।

গভীর সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের ঢেউ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল। খানিক বাদে ক্যাসল থেকে বেশ খানিকটা দূরে পৌঁছে হঠাৎ মুখ ফিরে তাকাল। আর খিলখিল করে হেসে উঠল। এ স্বপ্নে খাবার টেবিলে দেখা সেই মুখ। কত যুগ ধরে দেখে আসা সেই পরিচিত মুখ। নীল চোখটা অন্ধকারে জ্বলছে। অ্যালিস। অভীকের শুধু মনে পড়ে গেল আগের বারে কিন্তু ওরা কোথাও পৌঁছোতে পারেনি। সমুদ্রের জলেই ডুবে গিয়েছিল নৌকা।

এবারেও কি তাই হতে চলেছে? মাঝরাত। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। ওরা বহুদূরের একটা দ্বীপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছনে ফেলে-আসা ক্যাসলটাকে লক্ষ করল অভীক। আর দেখেই অবাক হয়ে গেল। ক্যাসলের ঘরগুলো আর অন্ধকার নেই। দেওয়ালের ফাঁক থেকে মোমবাতির আলো জ্বলছে। যেন তারাখচিত আকাশের নীচে এ মানুষের তৈরি আরেক আকাশ। আর দূরে তীরের ধারের টেনবীর রংচঙে বাড়ির সারি আর নেই। শুধু দূরে অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে কয়েকটা মাটির বাড়ি। নিঃশব্দে, চাঁদের আলোর কাছেও নিজের উপস্থিতিকে লুকিয়ে। আতঙ্কে আওয়াজ বেরোল না অভীকের। ও কি তাহলে শুধু ক্যাসল থেকে বেরিয়ে আসেনি, বেরিয়ে এসেছে ওর চেনা ২০১৫-র পৃথিবী থেকে! ১৮০০ সালের অচেনা জগতে? সামনের দিকে তাকাল অভীক। দূরের দ্বীপ দ্রুত কাছে এগিয়ে আসছে।



স্বপ্নের মধ্যে

বহুদিন বাদে বড়মামার খবর পেল সুমিত। খারাপ খবর। বড়মামা মানসিক রোগের জন্য হাসপাতালে ভরতি আছে। অবস্থা খুবই খারাপ।

সুমিতের বড়মামা ছিল খুব ভালো স্টুডেন্ট। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দিকে স্থান। তার পরে ডাক্তারি পড়ে নামকরা কলেজে। কিছুদিন সরকারি হাসপাতালেও যুক্ত ছিল। কিন্তু তারপরে হঠাৎ করে চাকরি ছেড়ে দেয়। বাড়িতে রিসার্চ ল্যাব তৈরি করে সারাদিন গবেষণা করত।

সবার মতে তখন থেকেই বড়মামার মাথা খারাপ শুরু। আর তারপর থেকেই প্রায় সবার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় বড়মামা। এক সুমিত বাদে।

সুমিতের চিরকালই সবথেকে প্রিয় ছিল বড়মামা। মনে হত বড়মামা

যেন এক অন্য জগতের মানুষ। কখনও কারুর সম্বন্ধে খারাপ কথা বলে না। খারাপ চিন্তা করে না। সবথেকে বড় কথা বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ। নানান বিষয়ে পড়াশোনা। সুমিতের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সেও বড়মামার থেকেই পাওয়া। বড়মামার ফোনও ছিল না। শুধু চিঠিতে যোগাযোগ রাখত। আর বাড়ির অন্য কাউকে চিঠি না লিখলেও বছরে অন্তত একবার চিঠি লিখত সুমিতকে। এত সুন্দর করে যে মানুষ চিঠি লিখতে পারে সে কি কখনও পাগল হয়?

তবে এ সব বহু বছর আগের কথা। তখন সুমিত স্কুলে পড়ত। গত তিরিশ বছর সুমিত চিঠিও পায়নি। যোগাযোগও করেনি। আসলে কাজের এত ব্যস্ততার মধ্যে বড়মামার কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। ও বেশ কয়েক বছর দেশের বাইরে ছিল। তারপরে ফিরে এসে পুনে চলে যায়। এর মধ্যে ও ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। বহুবছর চাকরিও করছে।

সুমিত বড়মামার শরীর খারাপের খবর পাওয়ার দুদিন বাদে কলকাতায় ফিরে এল। ঠিক করল একাই যাবে। কলকাতার থেকে মাইল চল্লিশ দূরে শহরতলিতে হাসপাতাল। যেতে সময় লাগল না। কিন্তু রোগী দেখার আগে অনেক নিয়মকানুন আছে এখানে। সব নিয়ম মেনে, নিজের পরিচয় প্রমাণ করে শেষে দেখা করতে করতে বিকেল প্রায় পাঁচটা বেজে গেল।

মামাকে আলাদা একটা ঘরে রাখা হয়েছে। এমনিতে নিজের খেয়ালেই থাকে। পাগলামির অন্য কোনও লক্ষণ কিছু নেই। শুধু যেন ঘুমের ঘোরে থাকে সবসময়। তাই দেখা করার সময় ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

মামা খাটের উপরে শুয়ে ছিল। সুমিত ঘরে ঢুকে বেশ কয়েকবার ডাকার পরেও সাড়া না দিয়ে শুয়েই ছিল। তার পরে যেন হঠাৎ করে চিনতে পেরে কোনওরকমে কনুইতে ভর করে আধশোয়া অবস্থায় অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—কে? কে?

—আমি সুমিত। চিনতে পারছ না মামা!

—ও আয়। বস। কতদিন বাদে! তোর চেহারাই ভুলে গিয়েছিলাম।—খুব স্বাভাবিকভাবে বলে উঠল মামা। তারপরে খানিকক্ষণ চুপ করে জানলার দিকে তাকিয়ে ফের বলে উঠল—আমার আসলে কিছুই হয়নি। ওরা বোঝে না। তাই এখানে রেখে দিয়েছে। সব বললে তুই বুঝবি।

—কী মামা?

—আগে ওই ব্যাগটা কাছে নিয়ে আয় তো।

পাশে কোণে পড়ে থাকা বিবর্ণ পিঠের ব্যাগটা নিয়ে এল সুমিত।

—ওর পকেটটা দেখ। একটা কাগজ আছে। কী আছে না?

ঠিক তাই। একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ ওই পকেটেই খুঁজে পেল সুমিত। মামা কি সত্যিই মানসিক রোগী? যে এত সহজে একটা কাগজ কোথায় রেখেছে তাও মনে রাখতে পারে, সে কি করে মানসিক রোগী হয়?

—কাগজটা সাবধানে রাখিস। আমি ওতে সব লিখে রেখেছি। আমার বাড়িতে কোথায় কি আছে?

—তা সেসব দিয়ে আমি কি করব? তোমার কাছেই রেখে দাও।

একটু যেন কষ্টের হাসি হেসে উঠল মামা।—আমার আর কি? হয়তো কালকেই আবার পথ হারিয়ে ফেলব? স্বপ্নের মধ্যে। তুই রেখে দে। বুঝতে পারবি। আমার সারা জীবন শুধু শুধু নষ্ট করিনি। যা আবিষ্কার করেছি তার অনেক কিছুই ওতে লেখা আছে। কিন্তু খুব সাবধান। আর কেউ যেন টের না পায়—শেষের কথাগুলো ফিসফিস করে বলে একবার চারদিক তাকিয়ে নিল মামা।

এই প্রথমবার মামার হাবভাব যেন স্বাভাবিক বলে মনে হল না সুমিতের। মামা চারদিক আরেকবার দেখে বলতে শুরু করল—

—বছর কুড়ি আগের কথা। 'স্বপ্ন' তৈরি শেষ হল। যন্ত্রটার নাম 'স্বপ্ন'ই দিয়েছিলাম। আমাদের ফেলে আসা অতীতের স্মৃতি ফের মনে করিয়ে দেবে ওই যন্ত্র।

—তা সেটা কী করে সম্ভব?

—আমরা যা দেখি, যা শুনি সবই কিন্তু স্মৃতিতে থেকে যায়। আমরা শুধু তা ব্যবহার করি না। আমাদের ব্রেনে হিপ্পোক্যাম্পাস বলে একটা অংশ আছে, যেটা নতুন স্মৃতি জোগাড় করে। আর আছে কর্টেক্স যা লং-টার্ম মেমারি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমরা যখন ঘুমোই তখন দিনের সব কাজের মধ্যে থেকে দরকারি অংশটুকুই শুধু হিপ্পোক্যাম্পাসে আলাদা করে সরিয়ে রাখে ব্রেন। এ ব্যাপারে আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ১৯৫৩

সালে ইউজিন আসেরিনস্কি প্রথম বলেন। কিন্তু ভাব তো? কী হত যদি আমরা সব কিছু মনে রাখতে পারতাম! আগে আমরা ভাবতাম বাকি সব স্মৃতি হয়তো হারিয়ে যায়। তা কিন্তু নয়। সব কিছুই থাকে। কিছু থাকে সাজানো গোছানো ফাইলের মধ্যে। আর বাকি সব থাকে মনের অন্ধকার ঘরে। সে স্মৃতি পড়ার ভাষাই আলাদা। আর সে ভাষাই আমি আবিষ্কার করলাম।—এতটা বলার পরে থামল মামা।

একটু যেন দম নিয়ে ফের বলে উঠল—কী যা বলছি তা কি পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে তোর? তা যা বলছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যদি অতীতে গিয়ে আগের সেই দিনগুলো ফিরে পেতাম, তাহলে কী ভালোই না হত! কী মজা হত তাই না? তা সেজন্যই 'স্বপ্ন' তৈরি করেছিলাম। যন্ত্রটা মাথায় পরে থাকলে, ইচ্ছেমতো আমার স্বপ্নের অতীতে আমি ফিরে যেতে পারতাম। শুধু তাই নয়, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনেক স্বপ্ন থাকে, অনেক ইচ্ছে থাকে, বাস্তবে যা হয় না। ভাবলাম যদি গভীর মনের এই স্বপ্নগুলো বার করে এইরকম একটা স্বপ্নের জগৎ তৈরি করা যায়, কীরকম হবে!

মামা একটু উদাস হয়ে গেল। খানিক থেমে ফের বলে উঠল—করলামও তাই। ওটা পরে থাকলে একটা অন্য জগতে হারিয়ে যেতাম। আমার বাবাকে দেখতাম। মাকে দেখতাম। বাড়ির পিছনের বাগানে চলে যেতে পারতাম। ওটাই ছিল আমার সবথেকে প্রিয় জায়গা। কী সুন্দর বকুলের গন্ধ! কী নরম সে ঘাস। তার উপরে খালি পায়ে হেঁটে বেড়াতাম। আর পাখির ডাক শুনতাম। ইচ্ছে হলেই নিমগাছের উপরে ডাল বেয়ে উঠে যেতাম। উপর থেকে দেখতাম চারদিক। সে যে কী সুন্দর অনুভূতি কী বলব? আমাদের পুরোনো বাড়ির বড় বড় ঘর—দালান—বারান্দা দিয়ে ইচ্ছেমতো কত ছুটোছুটি করতাম। সব স্বপ্নে। সব স্বপ্নে। বাস্তবটা যদি অত সুন্দর হত, তাহলে কী ভালো হত তাই না?

—মামা, এই স্বপ্নের জগতের কোনও অস্তিত্ব নেই। তুমি বেরিয়ে এসো এই কাল্পনিক জগৎ থেকে। এটাই তোমার অসুখ। এই যে আমার সঙ্গে কথা বলছ, কত স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তোমাকে।

কষ্ট করে যেন হেসে উঠল মামা—সবটা তো শোন আগে। এরকম

করে বেশ কাটছিল। হঠাৎ সেদিনটাকে দেখতে পেলাম।

—কোন দিন মামা?

—'দ্য ডে অফ সিঙ্গুলারিটি'? যেদিন ওরা আমাদের থেকে বুদ্ধিমান হয়ে উঠল। রাতারাতি। যন্ত্রেরা সব আমাদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠল। আর আমরা টের পাওয়ার আগে ওরা যেটা করল, সেটার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। কোনও যুদ্ধ না, অত্যাচার না, শুধু আমাদের সবাইকে স্বপ্নের রাজ্যে পাঠিয়ে দিল।

—তুমি কীসব আবোল-তাবোল কথা বলছ মামা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।—একটু দূরে সরে এল সুমিত। আসল অসুখটা এতক্ষণে বোঝা গেছে।

মামা আবার ফিস ফিস করে উঠল।—বুঝতে পারছিস না! তাই না! আমি রোবটদের কথা বলছি। আচ্ছা, তুই বল আমি যা এতক্ষণ বলেছি, তোর কি কোনও কথা অস্বাভাবিক লেগেছে! এখন এটা শোনার পরে তোর মনে হচ্ছে পাগলের প্রলাপ, কারণ এটা ভাবতে তোর মন প্রস্তুত নয়। শুধু কয়েকটা প্রশ্ন তোকে আজ করি। তুই একটু খোলা মনে ভেবে দেখ। তোর অফিসের বস কে? তার বস কে? একদম উপরে যে বসে আছে সে কে?

—মিস্টার এক্স। খুব উন্নত এক রোবট। তা তাতে কী? সেটাই তো স্বাভাবিক। ওরা ভুল করে না। সারাক্ষণ কাজ করতে পারে।

হেসে উঠল মামা—আচ্ছা, এটা তোর স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে? ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখবি এরকম আগে হত কিনা? তা সে ইতিহাসই বা জানবি কি করে তোরা! চোখটা তো আগে খোল। বুঝতে পারবি কে স্বপ্ন দেখছে, তুই না আমি। এই যে তুই এখানে এসেছিস ভাবছিস, সেটাও স্বপ্ন। তুই শুধু একটা ভিডিয়ো ফোনের মাধ্যমে আমার ত্রিমাত্রিক ছবির সঙ্গে কথা বলছিস? বাকিটা শুধু স্বপ্ন।

—কী সব বলছ মামা? আমি তো এই এখানে। বলে পাশের দেওয়ালটাকে ধরার চেষ্টা করল সুমিত। কিন্তু হাত পেল না।

—আগে আমিও তাই ভাবতাম। কিন্তু যেদিন 'স্বপ্ন' তৈরি করলাম সেদিন বুঝতে পারলাম কোনটা সত্যি আর কোনটা বাস্তব। আর তাই

তোরা স্বপ্নে পড়ে আছিস, আর আমি একা সেই স্বপ্নের বাইরে। জানি কী হচ্ছে। কোনটা সত্যি। সেটা যখন বলতে গেলাম, তখন ওরা আমাকে এখানে এনে ভরতি করল। আমার মতো যারা বলতে যায়, তাদের ওরা এখানেই নিয়ে আসে।

—কী বলছ মামা?

—হ্যাঁ, এটা তোর খেয়াল হয় না যে কেন মাথার উপরে সবসময় হেলমেটের মতো ওটা পরে থাকিস? খুলে ফেল। আসল জগৎটাকে দেখ। জেগে ওঠ তোরা। আর স্বপ্নের মধ্যে থাকিস না। ওরা তাই চায়।

আর কথা শুনতে পারল না সুমিত। মামা চোখের সামনে থেকে হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেছে। মাথার হেলমেটটা খুলতে গিয়ে হাত সরিয়ে নিল। সত্যিই কি এটা স্বপ্ন? বাস্তবটা তাহলে কী?

খেয়াল করল হাতে মামার দেওয়া যে কাগজটা ধরে আছে ভেবেছিল, সেটাও নেই।



নেপোলিয়নের সূত্র

মাঝ রাত। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মধ্যে বসে আছি। তিন ঘণ্টা আগে নিউইয়র্ক থেকে দিল্লি এসে পৌঁছেছি। আরো চার ঘণ্টা পরে আমার কলকাতার ফ্লাইট। মাঝের এই সময়টা সব সময় খারাপ লাগে। বাড়ির এত কাছে এসেও দূরে। প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছোতে আরও কয়েক ঘণ্টা। আর মাঝের এই তিন-চার ঘণ্টা ঘুম পেলেও ঘুমোনো যায় না। মনে হয় এই বুঝি পরের ফ্লাইটটা মিস করলাম। আবার এই দীর্ঘ যাত্রাপথের ক্লান্তিতে জেগে বসে থাকাও যায় না। ত্রিশঙ্কু অবস্থা।

ইকনমি ক্লাসে ঘুমোনো আর কলকাতার বাসে বসে গল্প লেখা একইরকম শক্ত। তাই মাঝে মধ্যে কয়েক মিনিটের ঢুলুনির বাইরে প্লেনে ঘুম আর আসেনি। আর এখন সেই ঘুমই মহা পরাক্রমে রাজ্য উদ্ধারে

সৈন্য সামন্ত নিয়ে আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলাম বোধহয়, একটা জোর আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি একটু দূরে একটা ট্রলির থেকে একটা বড় ব্যাগ পড়ে গেছে আর একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সেটাকে কোনওরকমে আবার ট্রলির উপরে তোলার চেষ্টা করছেন। বয়স সত্তরের কাছেপিঠে হবে। গায়ে প্যান্টের উপরে একটা হাফহাতা ঢোলা শার্ট। খানিক দূরে ওঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওনারও বয়স ষাটের উপরে হবে। এগিয়ে এলেন।

—দেখলে! বলেছিলাম না তোমায়, এটা উপরে রাখলে পড়ে যাবে।—বলে দুজনে আবার একসঙ্গে ওটাকে ট্রলির উপরে ওঠানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু দেখলাম দুজনে মিলেও হিমশিম খাচ্ছেন। জানি না এতটা পথ কীভাবে এই ব্যাগগুলো সঙ্গে করে এনেছেন!

আমি এগিয়ে গেলাম সাহায্য করতে। ট্রলিতে তুলে ট্রলিটা একটু ঠেলে দিলাম। আমি যেখানে বসেছিলাম, ওনারা সেখানে এসেই বসলেন। মুখে-চোখে এতটাই ক্লান্তি আর টেনশনের ছাপ যে আমার সাহায্যটাকেও যেন ওনারা ধন্যবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পেলেন না। শুধু কষ্ট করে হাসলেন।

—আপনারা কোথা থেকে আসছেন?—ওনাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলাম।

ভদ্রমহিলা একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেলে যেন দম নিয়ে বলে উঠলেন—আমেরিকা।

—তা আমেরিকার কোন জায়গা?

—শিকাগো। আমার ছেলে ওখানে থাকে।—ক্লান্তির মধ্যেও গর্বের সুর ফুটে উঠল মহিলার গলায়।

—তা সে তো অনেকটা পথ। তার মানে শিকাগো থেকে আবার একটা ফ্লাইট ধরে নিউইয়র্ক আসতে হয়েছে। তারপরে নিউইয়র্ক—লন্ডন, লন্ডন—দিল্লি। প্রায় ২০ ঘণ্টার জার্নি এর মধ্যেই হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ বাবা। এতো দূর। পথ যেন আর শেষ হয় না। তার মধ্যে আবার ওর শরীরটা খুব খারাপ।

—তা আপনারা হুইলচেয়ার নেননি?

—হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। কিন্তু বুঝতেই তো পারছ এত জায়গায় ঘুরে ঘুরে আসা। আর আমরা এত কথা বুঝিয়েও বলতে পারি না। এখানে নেমে তো হুইলচেয়ারের লোকই পেলাম না খুঁজে।

—হুইলচেয়ার পেলাম না। সাহায্য করার কেউ নেই।—পাশ থেকে বয়স্ক ভদ্রলোক আনমনে বলে উঠলেন।

মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে নীচুগলায় বলে উঠলেন—ও অঙ্কের প্রফেসার ছিল প্রেসিডেন্সিতে। কয়েক বছর ধরে শরীরটা ভালো নেই। তা ওকে নিয়ে এতটা জার্নি। কী অবস্থা বুঝতেই পারছ।

ভদ্রলোক দেখি নির্বিকারভাবে বসে আছেন আর দূরের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কীসব বিড়বিড় করে বলে চলেছেন—বড় কাঁটাটা ছোট কাঁটাটাকে আরও পাঁচবার ক্রস করবে আমরা ফ্লাইটে ওঠার আগে।

—আপনারা চা—কফি কিছু খাবেন?

—না, না—আমরা তেমন চা খাই না।—ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন।

ভদ্রলোক দেখি পাশ থেকে বলে উঠলেন—আমি খাব। বহুক্ষণ চা খেতে ইচ্ছে করছে।

মহিলা আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আমি বলার সুযোগ না দিয়ে ওনাদের আমার ব্যাগ দেখতে বলে উঠলাম। চা আনতে। চা নিয়ে ফিরে এসে ভদ্রলোকের হাতে দিতেই দেখি উনি ভারী খুশি। বাচ্চার মতো আনন্দে নীচু গলায় বলে উঠলেন—অনেক দাম এখানে। আমরা পথে একটা জায়গায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সঙ্গে বেশি টাকা নেই বলে আর নিইনি। তাই তো ও এরকম বলছিল।—বলে ওনার স্ত্রীর দিকে চাটা এগিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন—নাও, তুমি আগে খেয়ে নাও। আমি তারপরে খাচ্ছি।

—আপনি চা খাবেন জানলে আরেকটা নিয়ে আসতাম।—আমি আবার ওঠার উপক্রম করলাম আনার জন্যে।

—না না বাবা। ঠিক আছে। আমি একটু খাব।

ওনার স্ত্রীকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছিল। তাই সেটা কাটাতেই প্রশ্ন করে

উঠলাম—আপনার ছেলে কি ওখানেই বরাবর থাকে?

—হ্যাঁ, বহু বছর হয়ে গেছে। ওই তো আই.আই.টি থেকে পাশ করার পর ওই যে গেল, ওখানে মাস্টার্স করার পরে ব্যস ওখানেই রয়ে গেল। ওখানে কত সুযোগ সুবিধে। কারুর কি আর এদেশে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে? ওর বড় ছেলেটাও তো দুদিন বাদে ইউনিভারসিটিতে যাবে। নামকরা ইউনিভারসিটিতে চান্স পেয়েছে। কী যেন নামটা?

—বস্টন ইউনিভারসিটি।

—তা আপনারা? আপনারা কলকাতাতেই থাকেন?

—হ্যাঁ, কী আর করি বলো। এত করে বলে যেতে। কিন্তু এই শরীর নিয়ে কি আর বারবার যাওয়া যায়? আর জানি না কবে যেতে পারব? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মহিলা।

ভদ্রলোক দেখি অবাক চোখে ওনার দিকে তাকালেন।

—তা ওরা মাঝে মধ্যে আসে না কলকাতায়?

—হ্যাঁ, তা আসে। প্রায়ই আসে। তবে বুঝতেই তো পারছ এতজন মিলে আসা। অনেক খরচ। তার পরে ছুটি পাওয়া।

—পাঁচ বছরে একবার।—পাশ থেকে বৃদ্ধ বলে উঠলেন।

—তোমার কিছুই মনে থাকে না। এই তো তিন বছর আগে পুজোতে এল ওরা সবাই মিলে। ওদের ওখানকার বাড়িটাও এত বড়। কিছুদিন না থাকলে খুব মুশকিল হয়। বাড়ির মধ্যে বিশাল বাগান। কুড়ি একর ভাবতে পারো। কে দেখবে ওরা এখানে এলে?

—তবুও থাকার ঘর বেশি নেই—পাশ থেকে বৃদ্ধ আবার বলে উঠলেন।

—কোথায়? কতগুলো ঘর। নীচে ৪—৫ টা ঘর। দোতলাতেও তাই। আর বেসমেন্টও আছে। সেখানে জিম ও আরও অনেকগুলো ঘর।

—কিন্তু ওরা যে বলল আমাদের থাকার ঘর নেই।

মহিলা যেন তাড়াতাড়ি করে কথাটা থামানোর জন্য প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন।—দুই ছেলে, এক মেয়ে ওদের। তিন জনই রত্ন। যেমন ভালো পড়াশোনায়, তেমন খেলাধুলোয়।

একটু থেমে উনি আবার বলে উঠলেন—আসলে বাবুন তো খুব ভালো ছাত্র ছিল নিজে। তারপরে ওর বউ মিতা, সেও খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল। একসঙ্গেই আই.আই.টিতে পড়েছে ওরা। তা ওদের ছেলেমেয়েরাও তো ভালো হবে। তাই না!

—তা ওরা বাংলা বলতে পারে?

—না না, ওরা তো বাড়িতে ইংরেজিতেই কথা বলে। আমাদের সঙ্গে সামান্য বাংলা কথা বলতেই যা হিমশিম খায়। ওদের বন্ধুবান্ধবও তো সব ওখানকার। কার সঙ্গে বাংলায় কথা বলবে?

—নেপোলিয়নের সূত্র।—বৃদ্ধ হঠাৎ কথার মাঝে একটা কথা বলে উঠলেন।

—কি কিছু বললেন?

—হ্যাঁ, নেপোলিয়নের সূত্র।

—সেটা আবার কি?

—ধরো যে-কোনও ত্রিভূজের তিনটে বাহুর উপরে তিনটে সমবাহু ত্রিভুজ আঁকলে। এবার যদি তাদের কেন্দ্রগুলো যুক্ত করো, যে ত্রিভুজ পাবে সেটাও সমবাহু ত্রিভুজ। কি মজা না? এটাই নেপোলিয়নের সূত্র। উনি এটা যুদ্ধে প্রয়োগ করতেন।

—মানে?—হঠাৎ এই কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠলাম না।

—তুমি কি ওকে আবার অঙ্ক বোঝাতে শুরু করলে নাকি?—বলে মহিলা আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠলেন—ও মাঝে মধ্যে অঙ্ক নিয়ে কথা বলবেই। তা যা বলছিলাম, ওরা খুব ভালো ইংরেজি বলে, বোঝাই যাবে না বাঙালি। আর খাওয়া-দাওয়াও ঠিক ওখানকার মতোই। বার্গার, পিজ্যা, চিপস, স্যান্ডউইচ, স্যালাড। আমরা তো ওই সব খেতে অভ্যস্ত নই। তাও আবার রোজ রোজ। তাই কিছুদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে।

—পাঁচদিনে।—বৃদ্ধ আবার বলে উঠলেন পাশ থেকে।

কী বলছেন বুঝলাম না।

আমার অবাক ভাবটা খেয়াল করে মহিলা যেন একটু লজ্জিত হয়েই

বলে উঠলেন—আসলে এতটা পথ। ঘুমও হয়নি ঠিকঠাক। একটু থেমে ওনাকে উদ্দেশ্য করে ফের বলে উঠলেন—নাও, একটু ঘুমিয়ে নাও তো! শরীর ভালো লাগবে।

—ওদিকে শোয়ার জায়গা আছে। যাবেন?

—না না, এখন আমার ঘুম আসবে না। এখানেই ঠিক আছি।—বলে আমাকে আবার বলতে শুরু করলেন—তা নেপোলিয়নের সূত্র মানে কী জানো? সবকিছুতে ব্যালান্স রাখতে হয়। যুদ্ধের সময় উনি ওনার সৈন্যকে এমনভাবে দাঁড় করাতেন, যাতে যে-কোনও দিক থেকেই আক্রমণ আসুক না কেন কোনও মুশকিল না হয়। বুঝলে? শুধু শুধু তো আর ১৮০৯ সালে পুরো ইউরোপ ওনার অধীনে চলে আসেনি। এমনকী রাশিয়া, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্পেন, মিশর, ইতালি—বুঝলে সবই ওনার অধীনে চলে এসেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পরে এরকম আর কোনওদিন হয়নি।—একটু থেমে উনি ফের বলে উঠলেন—নেপোলিয়ন অন্যদের থেকে কোথায় আলাদা ছিলেন জানো? যুদ্ধকৌশলে উনি অঙ্ক আর বিজ্ঞান প্রয়োগ করেছিলেন আর ছিলেন সবার থেকে এগিয়ে। এমনকী যখন মিশরে গিয়েছিলেন, ওনার সঙ্গে ছিল ১৬৭ জন বিজ্ঞানী। উনি ফ্রান্সের অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স-এর প্রেসিডেন্টও ছিলেন। শুধু শুধু সর্বকালের সেরা জেনারেল বলা হয় ওনাকে!

একদিকে এতটা বুদ্ধি করে কথা বলছেন। অন্যদিকে বৃদ্ধের কথার মধ্যে কোনও লজিক নেই। হঠাৎ করে কোথা থেকে কী প্রসঙ্গে যাচ্ছেন! বেশ অবাক হচ্ছিলাম বৃদ্ধকে দেখে।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে মহিলা বলে উঠলেন—আহা, তুমি কি আবার পড়াতে শুরু করলে নাকি?—বলে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন—বাবুনকে তো ও সবক'টা সায়েন্স সাবজেক্ট নিজে পড়াত। কলেজ থেকে বাড়িতে ফিরেই ছেলেকে নিয়ে পড়াতে বসে যেত। আমাদের সব কিছুই ছিল বাবুন। কোনওদিন নিজেদের জন্য সময় দিতে পারিনি।

একটা নীরব দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুরু করলেন—বাড়িতে বুঝলে

পাঁচটা কুকুর। খুব দামি, দামি। এত ভালো করে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, যে কী বলব। মানুষের মতো কথা বোঝে। দুটো পাগ। দুটো ল্যাব্রাডর। আরেকটা কী জানি।

—স্নো ডগ। শিকারি কুকুর। খুব হিংস্র।—পাশ থেকে ভদ্রলোক ফের বলে উঠলেন।

—তা আপনার ছেলে কোথায় চাকরি করেন?

—ওই তো গুগল—না কী বলো না—তাতে খুব উঁচু পোস্টে আছে। এ বাড়িটা ছাড়াও ওর আরেকটা বাড়ি আছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। পরের বারে ওখানেই যাব।

—তা আপনারা এখানে এসেছিলেন কবে?

—ওই কিছুদিন আগে। তা সে কথা ছাড়ো। তুমি কী করো?

—আমি দু-মাস আগে অফিসের কাজে এসেছিলাম। ওয়াশিংটনে। কাজ করি পুনেতে। ওখানেই ফিরছি।

—বাহ, তা কি করা হয়?

—ইঞ্জিনিয়ার। একটা সফটওয়ার কোম্পানিতে আছি। কাজের জন্য মাঝেমধ্যে বাইরে যেতে হয়।

—বিয়ে হয়নি?

—না, এখনও করা হয়নি। মা আছেন কলকাতায়। মাঝেমধ্যে যাই। ছুটি পেলেই।—একটু থেমে ভদ্রলোককে আবার প্রশ্ন করে উঠলাম—তা আপনি নেপোলিয়নের সূত্র নিয়ে কী যেন বলছিলেন?

—ওই আর কি? নেপোলিয়নের সূত্র মানেই ভারসাম্যবোধ। কখন কোনদিকে কতটা আগ্রাসনে যাব। নাকি মূলত আত্মরক্ষায় নজর দেব। যেদিন ওই ব্যালান্সে সামান্য অসুবিধে হয়েছিল, সেদিনই হার হয়েছিল নেপোলিয়নের। রাশিয়া, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, ব্রিটেন, স্পেন, পর্তুগালের মিলিত সৈন্যদের হাতে। তা না হলে ওরা সবাই একসঙ্গে হয়েও নেপোলিয়নকে হারাতে পারত না। আমাদের শিক্ষায় ওই ভারসাম্য বোধেরই অসুবিধে ছিল। আমরা পড়াশোনাতে ভালো হতে শিখিয়েছি, মানুষ হতে শেখাইনি। ওকে নেপোলিয়নের সূত্র ছবি এঁকে বোঝাতাম,

কিন্তু আসল অর্থটা বোঝাতে পারিনি।

—কী সব যা তা বলছ? বাবুন কত ভালো ছেলে।

—পাঁচদিন। পাঁচদিনেই আর জায়গা হল না আমাদের। এত টাকা খরচ করে যাওয়া। বুঝতেই পারছ কত আর পেনশন পাই। ভেবেছিলাম কয়েকমাস থাকব। নাতি-নাতনি গুলোর সঙ্গে একটু আড্ডা মারব। আর ক'দিন আছি জানি না। কিন্তু জায়গা হল কই? ওদের বাড়িটা বড় ছোট।—বৃদ্ধ ফের বলে উঠলেন।

দেখলাম মহিলা মাথা নীচু করে বসে আছেন। আর দুজনেরই চোখে জল। কেন জানি না বৃদ্ধকে দেখে মনে হল হেরে যাওয়া নেপোলিয়নেরই মতো।



সব লজিকের বাইরে

ঘরের কোণে পড়ে থাকা রংচটা চামড়ার ব্যাগটা খুলতেই চমকে উঠলাম। ওর ভেতরে দু-বছর আগের খবরের কাগজ থেকে ছেঁড়া একটা টুকরো। একই সঙ্গে গত কয়েকদিনের খবরের কাগজের কাট-আউট।

তাহলে কি যা সন্দেহ করেছিলাম সেটাই ঠিক? তা না হলে হঠাৎ এইসব খবর আলাদা করে রাখার কী দরকার থাকতে পারে ওর?

রাম বাজার করতে বেরিয়েছে। আর সেই সুযোগে আমি ওর ঘরে ঢুকেছিলাম। খানিকক্ষণের মধ্যেই ও ফিরে আসবে। বহু বছর আমার বাড়িতে কাজ করে রাম। এখন প্রায় ঘরের লোকই হয়ে গেছে। ঘরের ফাইফরমাশ থেকে শুরু করে বাইরের যাবতীয় কাজ—সব ওই করে। আমার আর বাইরের পৃথিবীর মধ্যের সেতুবন্ধনের কাজটা পুরোপুরি এখন ওর হাতে।

ঘরের মধ্যে ব্যাগটা ঠিক যেরকম ছিল, কাগজের টুকরোটা ঠিক যেরকম ছিল, সেরকম অবস্থাতে রেখেই চলে এলাম। আমার ফ্ল্যাটের লাগোয়া সারভেন্ট কোয়ার্টার। আমি ওর ঘরে কখনোই আসি না। আজকে বহুদিন বাদে ঢুকলাম। আর ঢুকতেই, যে আশঙ্কাটা করছিলাম সেটা সত্যি প্রমাণিত হয়ে গেল।

ঘরে ফিরে চুপ করে বসে থাকলাম। দু-বছর আগে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। চাকরি ছাড়ার পরে আজকাল সময় যেন আর কাটতেই চায় না। সারা গায়ে জড়িয়ে থাকা সাপের মতো দুঃস্বপ্ন—খারাপ চিন্তাগুলো সবসময় আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। আর আমি তার থেকে বেরোনোর জন্য হাঁসফাঁস করি। ফ্ল্যাটের নীরবতা দিনকে দিন যেন আরও বেড়ে চলেছে। বারান্দায় বেরিয়ে এলাম।

আর কয়েকদিন বাদে পুজো। কিন্তু শরতের সেই নীল আকাশের রং কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। উপরে শুধু উদাসীন বিবর্ণ ধূসর আকাশ। যেন আমারই মতো সবার থেকে নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে চায়।

দূরে বেশ কয়েকটা ঘুড়ি উড়ছে। আর মাঝেমধ্যে ভোক্কাটা চিৎকারটা হাওয়ায় ভেসে আসছে। আমিও অজানা কারণে একটা কাটা ঘুড়ি দেখে 'ভোক্কাটা' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। স্কুলগুলোতে ছুটি শুরু হয়ে গেছে বোধহয়। তাই দূরের ছাদগুলোতে বাচ্চাদের দেখা যাচ্ছে।

আমার ফ্ল্যাটটা তিন তলায়। সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে কমপ্লেক্সের কয়েকটা বাচ্চা ব্যাডমিন্টন খেলছে। দূরে বাগানে মালি কাজ করছে। নতুন গাছ লাগাচ্ছে। হাসনুহানা, বকুল। কমপ্লেক্সের মধ্যে একটা ছোট পুকুর আছে। সেখানে কয়েকটা রাজহাঁস থাকে। এখন সেগুলো দল বেঁধে দিব্বি দাপটে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এসব দেখলে ঘড়ির থেমে থাকাটা তবু খানিকটা কম বোধ হয়।

সবই আছে, কিন্তু কিছুই যেন নেই। বারবার ওই এক কথাই মনে করিয়ে দেয়। ঘরের মধ্যে যেদিকেই তাকাই শুধু রিনি। ওর স্কুলের ব্যাগ, ওর ছোটবেলার খেলার পুতুলগুলো, দেওয়ালে ওর আঁকা পেন্সিলের উইকেট, সারা ঘর জুড়ে ওঁর আঁকা ছবিগুলো, ওর পড়ার বই, ওর

সাজের বাক্স—যতই দেখতে না চাই, ততই যেন বেশি করে চোখের সামনে চলে আসে।

অন্যদের মতো আমার আড্ডার অভ্যেস কোনও দিনই ছিল না। টিভি দেখার অভ্যেসও ছিল না কোনওদিন। যেটুকু সময় পাই, বই নিয়ে কাটাই।

আজও নিয়মমতো সকালের খবরের কাগজে চোখ রাখলাম। যে খবরটা খুঁজছিলাম, পেয়েও গেলাম। আজকেও প্রথম পাতার নীচের দিকে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে খবরটা। পরপর সাত মাস ধরে মাসের ঠিক তেরো তারিখে উত্তর কলকাতার হেদুয়ার কাছাকাছি বেশ কয়েকটা জায়গায় খুন। অপরাধীকে এখনও ধরা যায়নি। কিন্তু একজনের হাতেই যে এসব খুন, তা নিশ্চিত। সন্দেহ করা হচ্ছে যে খুনি ওর কাছাকাছি কোনো জায়গাতেই থাকে।

সেখানকার রাস্তা—অলিগলি সব তার চেনা। তা না হলে সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে যেভাবে সে একের পর এক খুন করে চলেছে, তা কী করে সম্ভব। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই একই ভাবে খুন করা হয়েছে। খুব ধারালো ছুরি দিয়ে হঠাৎ করে আক্রমণ।

এতটাই হঠাৎ করে আক্রমণ যে কেউ সামান্য বাধা দেওয়ারও সুযোগ পায়নি। অবশ্য তাতে এটাও প্রমাণিত হয় যে খুনির গায়ে অসম্ভব জোর। প্রত্যেকটা খুনই হয়েছে রাত ১০টার খানিক পরে। তখন লোক চলাচল কম থাকায় হয়তো কারো চোখে পড়েনি।

মৃতদের প্রত্যেকেই স্থানীয় বাসিন্দা। কাগজে লিখেছে নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও ঘটনা বা ব্যবসার সঙ্গে এরা যুক্ত ছিল। আর সেই যোগসূত্রটাই খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

আরও নানান খবর। পড়তে ভালো লাগল না। জানলার বাইরের আকাশের রং এখনও ফিকে। তবু তার দিকেই তাকিয়ে বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকলাম। ওটাই আসলে আমার জীবনের রং। রিনির মা আগেই মারা গিয়েছিল ক্যান্সারে। তাই রাম ছাড়া এখন আর আপনার বলতে কেউ নেই।

খানিকবাদে রাম ফিরে এল। ওকে কোনও ভাবে বুঝতে দিলাম না যে আমি ওর ঘরে গিয়েছিলাম। ও প্রায় পঁচিশ বছর আছে। বিহার থেকে এসেছিল। যখন এসেছিল তখন ওর বয়েস আর কত হবে, বড় জোর ছয়-সাত। আমার কাছেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশোনা করেছে। বুদ্ধি আছে ভালোই। আমার সঙ্গে আগে মাঝেমধ্যে দাবাও খেলত। এখন অবশ্য আর খেলা হয় না।

এখন জোয়ান—তাগড়াই চেহারা। নিয়ম করে রোজ ব্যায়াম করে। এমনিতে খুব চুপচাপ, ভদ্র। কী ভাবছে তা বোঝার কোনও উপায় নেই। মুখে কখনোই কোনও কথা নেই।

যখন যা কাজ বলি, কখনও কোনও বিরক্তি নেই। শুধু ওই এক টিভির নেশা। আমার বাড়ির টিভিটা ওরই কাজে লাগে। সন্ধে হলেই আমি পড়ার ঘরে পড়াশোনা করতে বসি, আর ও টিভি চালিয়ে দেখতে বসে যায়।

আজকেও তাই হল। শুধু ড্রয়িংরুম থেকে ভেসে আসা টিভির শব্দে ওই খবরটা ফের শুনতে পেলাম। আজকে আবার ১৩ তারিখ। আজকে আবার সেই রাত। পরপর সাত মাসের ঘটনা কি আরেকবার ঘটতে চলেছে? অষ্টমবার? আজকে কে জানে কার ভাগ্যে মৃত্যু?

খবরে বলছে বিশেষ একটা ক্লাবের সদস্যদের পুলিশ সতর্ক করে দিয়েছে। মৃতদেহ দুইজন ওই ক্লাবেরই সদস্য। প্রতিবছর ওই ক্লাবটা বড় দুর্গাপুজো করে। হতে পারে ওই পুজো নিয়ে কোনও দলের সঙ্গে রেষারেষির জেরে এই খুনগুলো হচ্ছে। এসব নিয়ে টিভিতে আলোচনা হচ্ছে। আলোচনা শুনে বেশ মজা লাগল। একজন এমনভাবে গলা ফুলিয়ে চিৎকার করছে যেন খুনি ওরই চেনা-পরিচিত। খানিকবাদে মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। বইয়ের পাতায় ডুব দিলাম।

রাত ন'টা নাগাদ রাম ডাকতে এল। রান্না হয়ে গেছে। আমাকে খেতে দিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রাম ওর নিজের ঘরে চলে গেল। সকালের আগে ওর আর কোনও কাজ নেই। আমিও রাত দশটা নাগাদ আলো নিভিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম। এ বিল্ডিং থেকে কেউ বেরোলে এখান থেকে ঠিক দেখা যায়। আমার ধারণা, আজকে রাম বেরোবে।

আর ওর গন্তব্য হবে উত্তর কলকাতা।

বাইরে এখন বেশ ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে। শনশন শব্দ। পাশের ফ্ল্যাটের বারান্দায় মেলা একটা জামা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। একটা কাটা ঘুড়ির মতো জামাটাকে নিয়ে খানিকক্ষণ খেলা করে দৃষ্টির বাইরে নিয়ে চলে গেল। আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটা ফ্যাক্টরি। পুজো সামনে। তাই এত রাতেও কাজ চলছে। মেশিনের আওয়াজ আসছে। এসব দেখতে দেখতে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হল না। লক্ষ্য করলাম আমাদের বাড়ি থেকে কেউ যেন সতর্কভাবে বেরিয়ে একবার মাথা উঁচু করে তাকাল, আর তারপরে দ্রুতপায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। রাম। হাতে একটা চটের থলি। আমি অন্ধকারে বসে আছি। তাই আমাকে ও দেখতে পায়নি। ও কোথায় যাবে আমি জানি। আর কেন যাচ্ছে তাও জানি।

আমি জামা পরে প্রস্তুত ছিলাম। তবু খানিকক্ষণ বসে থাকলাম, যাতে পথে দেখা না হয়ে যায়। ও তো আর গাড়ি করে যাবে না। হেঁটে যাবে, না হয় বাসে যাবে। আমার অনেক সময় আছে। মিনিট কুড়ি বাদে নীচে নেমে এলাম। গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বার করে রওনা দিলাম। হেদুয়া পৌঁছতে মিনিট কুড়ি লাগল। হাতঘড়ির কাঁটা বলে দিচ্ছে সময় এখন সওয়া দশটা। গাড়িটা মদন সরকার লেনের পাশে রেখে আস্তে আস্তে ছোট ছোট চেনা অচেনা গলি ধরে হাঁটতে লাগলাম।

আমি জানি রাম আজ কোথায় যাবে। রাস্তায় লোক নেহাতই কম। পুজোর আগে রাস্তায় লোক একটু বাড়ে। কিন্তু আজকের রাতে কেউ বাধ্য না হলে বেরোবে না।

যদি খুনের জায়গাগুলো দেখা যায়, সেটা কাছাকাছি হলেও ছড়িয়ে আছে আট-নয় স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। অত্যন্ত ঘন বসতি এলাকা। প্রচুর সরু সরু অলিগলি। আর তাই অপরাধী ঠিক কোথায় যাবে, কোথায় তার পরের শিকারকে খুঁজবে, তা জানা সাধারণের কথা তো বাদই দিলাম, পুলিশের পক্ষেও সহজ নয়।

খানিকটা হাঁটার পরে বুঝলাম আজকে যেখানে রাম যাচ্ছে, তার কাছে

পৌঁছে গেছি। কমদামি পুরোনো একটা শাল নিয়ে এসেছিলাম। শালে সারা গা ঢেকে বাসস্ট্যান্ডের কাছে ফুটপাতের উপরে শুয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

খানিক বাদে একটা বাস এসে দাঁড়াল। আর তার থেকে প্রত্যাশামতো রাম নেমে এল। খেয়াল করলাম ওর হাতের ব্যাগটা এখনও আছে। আর তার মধ্যে কিছু একটা আছে, সেটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে। আশপাশ একটু দেখে নিয়ে ও রাস্তা পার হয়ে উলটো দিকে চলে গেল। তার পরে যেদিকে যাবে ভেবেছিলাম, সেদিকেই এগিয়ে গেল। আমিও মিনিট দুয়েক বাদে উঠে পড়লাম। একটু দূর থেকে ফলো করতে থাকলাম। ও কোথায় যাবে তা আমি ভালোই জানি। ও বেশ জোরে হেঁটে যাচ্ছে। আমি তাই একটু পিছিয়ে পড়ছিলাম।

হঠাৎ দূর থেকে কয়েকজনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। পা চালিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, একটা ছোট তিন রাস্তার মোড়ের কাছে বেশ কয়েকজন লোক রামকে ঘিরে ফেলেছে। ওদের হাতে বন্দুকও আছে। পুলিশের লোকই হবে। আজ ওরা ছদ্মবেশে অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। রামও প্রায় বিনা বাধায় ধরা দিয়েছে।

যাক, অবশেষে পুলিশের সাফল্য এল। গত সাত মাসের ঘটনাপ্রবাহে ওদের মুখ দেখানোর মতো অবস্থা ছিল না।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও শেষে তাহলে বুঝে গেছে এই খুনের প্যাটার্ন। প্রত্যেকটা খুন হয়েছে এমন একটা বাড়ির সামনে যা হল কিনা একটা মৌলিক সংখ্যা। ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭। ক্রমবর্ধমান। আজকের ঠিকানা তার পরের মৌলিক সংখ্যা ১৯। ১৯ নম্বর হরিমোহন লেন।

রামকে এক সময় আমি নিজের হাতে অঙ্ক শিখিয়েছি। একসঙ্গে দুজনে মিলে ধাঁধা সল্‌ভ করেছি। রোজ কাগজ এলে শব্দজব্দ নিয়ে আমার আর ওর মধ্যে প্রতিযোগিতা হত। মাঝেমধ্যে ধাঁধার বই নিয়ে এসে ওকে দিতাম। আর কী খুশিই না হত। প্রথাগত পড়াশোনা না করলেও আজও ওর মধ্যে ওই ধাঁধার নেশাটা রয়ে গেছে।

প্রথম খুন ২ আমতলা সরণি। দ্বিতীয় খুন ৩ বটকেষ্ট লেন। তৃতীয় খুন ৫ চারুচন্দ্র লেন। চতুর্থ খুন ৭ দীনবন্ধু মিত্র লেন। পঞ্চম ১১ এনাক্ষী মুখার্জি লেন। ষষ্ঠ ১৩ ফটিক মিত্র রোড। সপ্তম ১৭ ঘনশ্যাম দাস লেন। নাহ, কলকাতা পুলিশ অতটা বোকা নয়। তারা লক্ষ্য করেছে যে শুধু বাড়ির নাম্বার নয়, প্রত্যেকটা রাস্তার প্রথম অক্ষরগুলোর মধ্যেও একটা সহজ হিসেব আছে। ইংরাজিতে সাজালে হয় a, b, c, d, e, f, g. অর্থাৎ ক্রম অনুযায়ী তার পরেরটা যে h দিয়ে রাস্তা কোনও হবে, সেটা বোঝা কোন শক্ত কাজ নয়। আর h দিয়ে যদি দুটো রাস্তা থাকে সেক্ষেত্রে নামের পরের অক্ষরটাকে ওই একইভাবে সাজালে যে নামটা প্রথমে আসে, সেই রাস্তাই বেছে নেওয়া হয়।

কিন্তু খুনটা কীভাবে সম্ভব? খুনের কারণটা কী? কোনও ভাবেই বোঝা যায় না যে ঘটনাক্রমে খুনির শিকার ঠিক ১০ টার পরে ওই রাস্তাতেই এসে পড়ছে কীভাবে। এর একটাই অর্থ হতে পারে। খুনি যাকে মারবে বলে ঠিক করেছে, তাকে কোনওভাবে ওই জায়গাতে আসতে বলেছে, বা আসতে বাধ্য করেছে। আর তারপরে হত্যা করেছে। কিন্তু কোনও কারণ পাওয়া যায় না। যারা খুনের শিকার, তাদের মধ্যে তো আর কোনও যোগসূত্র নেই। আর সেখানেই অনুসন্ধান আর এগোচ্ছে না।

নাহ, ওদের সে বোঝার ক্ষমতা নেই। পাগলের মন বোঝার ক্ষমতা ওদের নেই। এই সিকোয়েনস, এই লজিক, সবই ওদের আরও বিভ্রান্ত করার জন্য।

মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালাম। একটা ধারালো ছোরার মতো এক ফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে। আকাশেও যেন রক্তের দাগ। সরু গলির দু-পাশ দিয়ে রোগা-ক্ষয়া চেহারা নিয়ে বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

এগিয়ে গেলাম যেখানে যাওয়ার কথা ছিল। ২৩ ঈশ্বর দত্ত লেনের খোঁজে। কালকে রাম ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবে, যখন পুলিশ জানবে আজকে রাতেও সেই একই আততায়ী একই ভাবে খুন করেছে। ১৯ নাম্বার হরিমোহন লেন-এ নয়। ২৩ ঈশ্বর দত্ত লেনের কাছে। আমি যে পরের

মৌলিক সংখ্যা আর রাস্তা নিয়ে ভেবেছি, সেখানেও যে আজকে রাতেই কিছু হতে পারে, তা এখন পুলিশের ধারণার বাইরে। সেটা কিনা এখান থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে।

এখনও মনে আছে রিনির মৃত্যুর খবরটার কথা। খবরটা পেয়েছিলাম রাত এগারোটায়। সন্ধেবেলা বাংলার টিচারের কাছে পড়ে ফিরছিল রিনি। কিন্তু বাড়ি আর ফেরেনি।

আর তারপর চব্বিশ মাস, ১৭০০০ ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। অনুসন্ধান করে পুলিশ আজও কোনও খুনিকে ধরতে পারেনি। পাবে কী করে। এ তো আর একজনের কাণ্ড নয়। শোনা যায় আটজন একসঙ্গে ছিল। আর অনেকে ঘটনাটা দেখেও ছিল। কয়েকজনকে ধরা হলেও পরে সবাইকে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হয়েছে। কোনও সাক্ষী পাওয়া যায়নি। আর খুনের পিছনে কোনও কারণও, কোন লজিকও নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি। সবার উপরে আইনের সেই নীতি। 'ei incumbit probatio quidicit'। যার অর্থ অপরাধীর অপরাধ প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ ছাড়া কাউকে অপরাধী বা খুনি বলা যাবে না।

কথাটা হয়তো ঠিক। আর তাই আমাকেও ওরা ধরতে পারবে না। যেখানে খুনের কোনও মোটিভ থাকে না, তার পিছনে কোনও কারণ থাকে না, কে খুন হবে তা যখন জানা যায় না, সেখানে খুনিকেও ধরা যায় না।

শুধু সেই ধরতে পারবে যে আমাকে কাছ থেকে দেখেছে। আমার পরিবর্তন দেখেছে। রাম। ও আমাকে খুবই ভালোবাসে। একটা অনাথ ছেলের যা হয় আর কী। ওর পুরো পৃথিবীটাই আজ আমাকে ঘিরে। আমাকে ও ওর নিজের বাবার মতো দেখে। তাই তো আজও ও আমার জায়গা নিয়ে আমাকে না জানিয়ে পুলিশকে বোকা বানাতে এসেছিল। আইনের চোখ থেকে আমাকে বাঁচাতে।

রাত বাড়ছে। ২৩ ঈশ্বর দত্ত লেনের একটা বাড়ির রকে গিয়ে বসলাম। পাশে একটা কুকুর বসে আছে। লেজ গুটিয়ে। ওই থাকবে আজকে রাতের ঘটনার একমাত্র সাক্ষী।

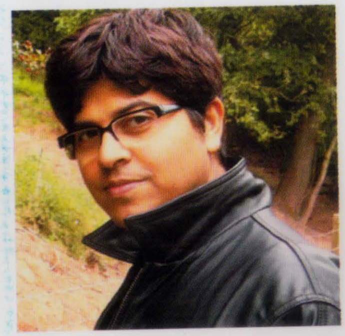
নাহ্। আর ভালো লাগছে না। আজ কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। হাওয়াতে সব ছায়াগুলো কাঁপছে। ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যের দাগগুলো আবার মুছে যাচ্ছে। দেখি কে এখন এখানে আসবে? জীবন আর মৃত্যুর মাঝে পড়ে থাকা এই সরু গলিটা পেরিয়ে। গুনগুন করে আমার প্রিয় গানটা শুরু করলাম।

'আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব, সারারাত ফোটাক তারা নব নব, নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো, যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো।'

আমি চোখ না খুলেও এখনও দেখতে পাচ্ছি একটা স্কুলের ব্যাগ, ঘরময় রঙিন ছবি, আর রিনি। আমার একমাত্র মেয়ে। হারিয়ে গেছে। চিরকালের মতো। বিবর্ণ আকাশের অন্য কোনও প্রান্তে ও হয়তো আছে। খানিকবাদে আজও ও এই পাড়া দিয়ে যাবে। আর তার পিছু পিছু যাবে অজ্ঞাত সেই আততায়ী। আর তখনই হতে চলেছে অষ্টম খুন। শুনেছিলাম ওরা আটজন ছিল।



তরুণ প্রতিশ্রুতিমান লেখক হিসাবে অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী ইতিমধ্যেই বাংলা-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নাম।
মূলত কিশোর সাহিত্যের একনিষ্ঠ কলমকার হিসাবে অভিজ্ঞানের প্রিয় বিষয় কল্পবিজ্ঞান, যা সববয়েসি পাঠককে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে।
'সব লজিকের বাইরে' এই গল্প সংকলনে দশ-দশটি অনবদ্য কল্পবিজ্ঞান-অ্যাডভেঞ্চার ছাড়াও অভিজ্ঞান সাজিয়ে দিয়েছেন আরও ৮টি অন্য স্বাদের গল্পও, যেগুলি কোনওটা রহস্য, কোনওটা ভৌতিক বা অলৌকিক, কোনওটা আবার একান্তভাবে মানবিক।
বিশিষ্ট অগ্রজ সাহিত্যিক অনীশ দেব তাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভূমিকায় লিখেছেন, 'ওর লেখায় একটা বিশেষ ধরনের আকর্ষণ থাকে—যেটা অভিজ্ঞানের অভিজ্ঞান, অথবা সিগনেচার।'
এই 'সিগনেচার'-এর ছোঁয়া পেতে হলে 'সব লজিকের বাইরে' পড়তেই হবে।



জন্ম ১৮ এপ্রিল ১৯৭০, কলকাতায়। হিন্দুস্কুলের কৃতী ছাত্র। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও আইআইএম কলকাতা থেকে অপারেশন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা। বর্তমানে ভারতীয় শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে কর্মসূত্রে ইংল্যান্ডের ওয়েল্‌স-এ প্রবাসী।
লেখালেখির শুরু ১৯৯৪-এ কিশোর ভারতী ও আনন্দমেলার পাতায়। লেখার বিষয় প্রধানত বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান, রহস্য হলেও কিশোরসাহিত্যের অন্য ধারাতেও সমান স্বচ্ছন্দ এবং জনপ্রিয়।
পত্রভারতী প্রকাশিত গ্রন্থ—**ক রহস্য, ভৌতিক অলৌকিক, মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, সংকেত রহস্য, রহস্য যখন ডারউইন** ইত্যাদি।
লেখালেখি, বিজ্ঞানচর্চা ছাড়াও অভিজ্ঞানের আরও এক নেশা—ব্যাডমিন্টন খেলা।

প্রচ্ছদ **অগ্নিভ সেন**

এই গল্প সংকলনে দশ-দশটি অনবদ্য কল্পবিজ্ঞান-অ্যাডভেঞ্চার ছাড়াও অভিজ্ঞান সাজিয়ে দিয়েছেন আরও ৮টি অন্য স্বাদের গল্পও, যেগুলি কোনওটা রহস্য, কোনওটা ভৌতিক বা অলৌকিক, কোনওটা আবার একান্তভাবে মানবিক।

পত্রভারতী

ISBN 978-81-8374-446-1

9 788183 744461

www.bookspatrabharati.com